শোনো শোনো গল্প শোনো

আশাপূর্ণা দেবী

শোনো শোনো গল্প শোনো

দেব
াহিত্য
কুটীর

আশাপূর্ণা দেবী

SHONO SHONO GALPO SHONO
CODE NO. 62 S 22

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

পুনর্মুদ্রণ
জানুয়ারী
১৯৯৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম্‌স্‌ প্রিণ্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা (উত্তর)

●আমার কথা=

বই-এর যেমন একটা মলাট থাকে, সূচীপত্র থাকে, তেমনি একটা ভূমিকা থাকাও দরকার। নইলে, এ বই-এর ভূমিকার কোন দরকার ছিল না।

জমিদার-বাড়ী নেমন্তন্ন, পাতা পড়ে গিয়েছে, খাবার ডাকও এসে গিয়েছে, তখন যদি কেউ বলে, দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, একটা কথা আছে.—সে-কথা তখন কে শুনতে চায়?

শোনো শোনো গল্প শোনো, এ ডাক দিয়ে যিনি তোমাদের ডাকছেন আজকের বাংলা-সাহিত্যে তিনি একজন সেরা গল্প-বলিয়ে। তাঁর লেখা, তাঁর গল্প, তাঁর গল্প-বলার ধরন আজকের বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বিষয়। তাঁর গল্পের বাঁধুনী, গল্প-বলার কায়দা বিস্ময়কর।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও তিনি গল্প লিখেছেন, অপূর্ব্ব সব গল্প, যা এই বইতে পরিবেশন করা হয়েছে। ছেলেদের সেই লেখা সার্থক, যে-লেখা পড়ে ছেলে-বুড়ো সবাই খুসী হয়, সবাইকে সমান ভাবে যা আকর্ষণ করে। এই বইটির প্রত্যেকটি গল্প ছেলে-বুড়ো সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে, মুগ্ধ করবে।

এই সম্পর্কে এই বই-এর প্রকাশক সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। মুদ্রণের পারিপাট্যে, সু-অঙ্কিত ছবির অলঙ্কারে তাঁরা যে-যত্ন নিয়ে বইটি প্রকাশিত করেছেন, তার জন্যে পাঠকদের তরফ থেকে তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাজা সুখাদ্যের গন্ধ বাতাসে আসছে, সামনেই মহৎ-ভোজের আয়োজন, আর কথা দিয়ে তোমাদের বিলম্ব ঘটাতে চাই না।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এতে কী আছে ?

১। কি করে বুঝবো ... ১
২। মুষ্টিযোগ ... ১২
৩। সমঝদার ... ২৪
৪। খেলা ... ৩৫
৫। অপরাধী ... ৪৬
৬। হুঁসিয়ার ... ৬০
৭। গোবিন্দ চরিতামৃত ... ৬৯
৮। প্রতিশোধ ... ৮৬
৯। আকাশের স্বাদ ... ১০১
১০। বর্ণচোরা ... ১১৪
১১। ছেলেমানুষ আর কাকে বলে? ... ১২৫

১২। ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয় ১৩৯
১৩। মঘা ১৫৫
১৪। সাধু সংকল্প ১৬২
১৫। ব্রতভঙ্গ ১৭৫
১৬। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে ১৮৬

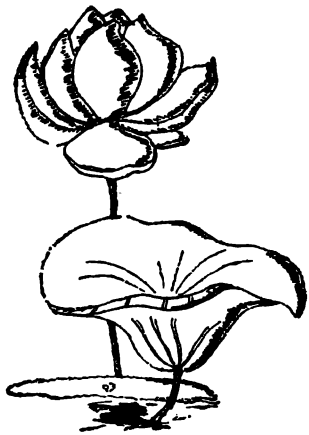

"কি ক'রে বুঝবো"

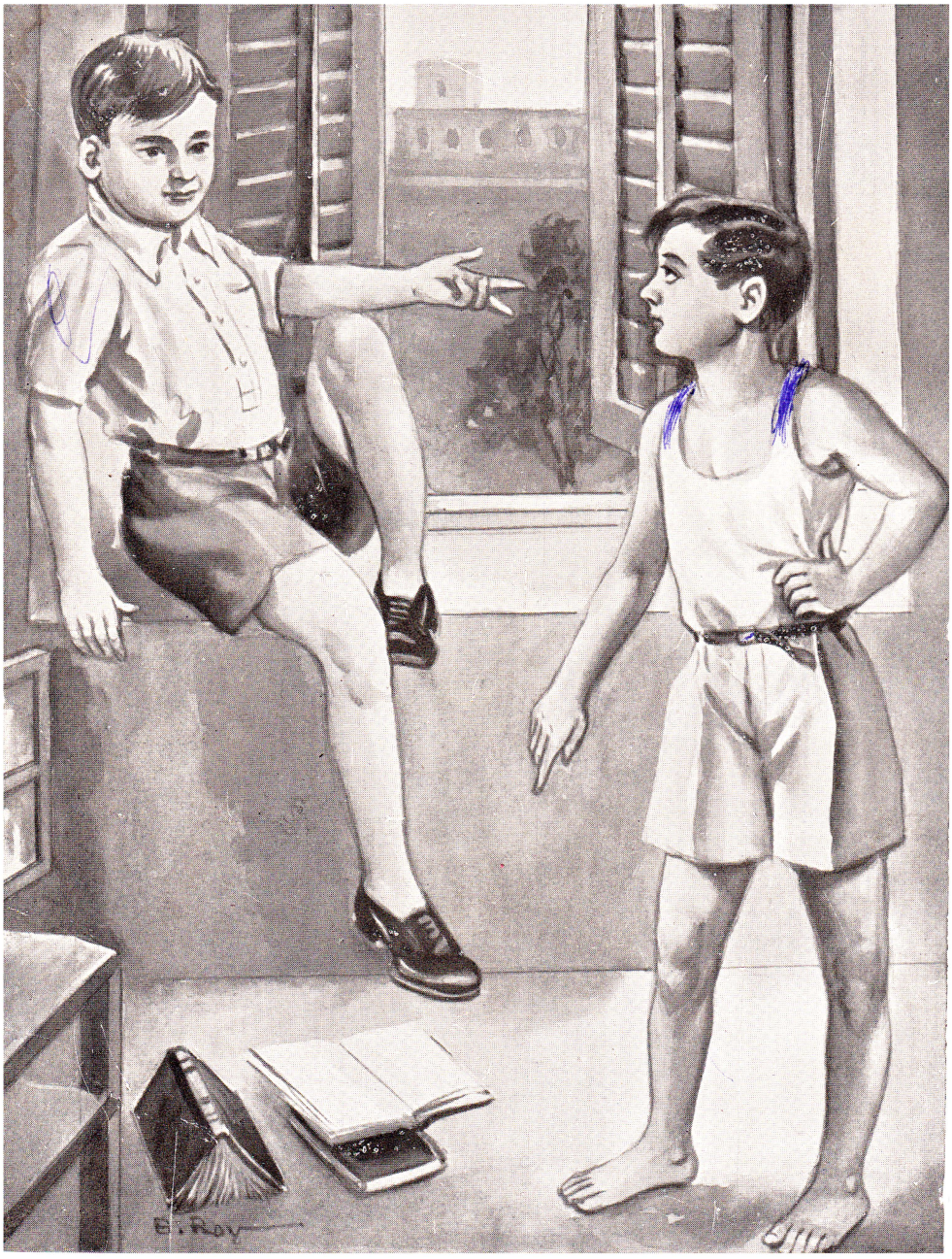

"কি করে বুঝবো"

ছ' বছরের বুকু বাড়ীর বাইরের রোয়াকে ব'সে খেলা করছিলো। বাড়ীর সামনে একখানা রিকশ-গাড়ী এসে থামলো। রিকশ থেকে নামলেন দু'টি বেজায় মোটা-সোটা ভদ্রমহিলা আর একটি বুকুর মতো বয়সেরই ছেলে। সেটিও নেহাত রোগা নয়!

বুকু খেলতে খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়,—আরে বাবা! রিকশ-গাড়ীর অতোটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা হয়েছিলো কি ক'রে!

দু'টি মহিলার মধ্যে একটি মহিলা রোয়াকে উঠে একগাল হেসে বলেন—কি খোকা, চিনতে পারছো?

এতেই ছেলে শাসন করা হয়ে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা মনে মনে বুকুর মুণ্ডুপাত করেন।...কি অসভ্য ছেলে বাবা! কথা নয় তো, যেন ইঁট-পাটকেল! ছেলেকে কি শিক্ষাই দিয়েছে নির্ম্মলা।

এইবার ঘরে এসে ঢোকেন বুকুর মা নির্ম্মলা।

আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে ঢোকা দেখেই বোঝা যায়, কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরে ঢুকেই হৈ-হৈ ক'রে অভ্যর্থনা সুরু করে দেন—ও মা, আমার কী ভাগ্যি! ছেনুমাসী-বেণুমাসী যে! এতদিনে বুঝি মনে পড়লো? আমি তো ভেবেছিলাম, ভুলেই গ্যাছো আমাকে। সত্যি, কতকাল পরে দেখা—কী আনন্দ যে হচ্ছে কি ক'রে বলবো! এত ভালো লাগছে ছেনুমাসী—

বুকুর মা যতক্ষণ কথা কইছিলেন, বুকু অবাক হয়ে—ফ্যাল্-ফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। কথা শেষ হতেই বলে ওঠে—ও কি মা? এইমাত্তর যে বললে—'বাবারে, শুনে গা জ্বলে গেল! অসময়ে লোক বেড়াতে আসা! ভালো লাগে না— এখন আবার 'ভালো লাগছে' বলছো কেন?

ছেলের কথা শুনেই বুকুর মা'র মাথায় বজ্রাঘাত!

এ কী সর্ব্বনেশে ছেলে!

তিনি না-হয় বলেই ফেলেছেন দুটো কথা, তাই ব'লে এমনি ক'রে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে?

ওদিকে 'ছেনু' 'বেণু' দুই বোনের দুই দ্বিগুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে। তাঁরা বলে কত তোড়জোড় ক'রে সেই উত্তরপাড়া থেকে ভবানীপুরে ছুটে এসেছেন, পাতানো-বোনঝিটির সঙ্গে দেখা করতে, আর তার কাছে কিনা এই অভ্যর্থনা!

এদিকে বুকুর মা'র যে সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে, তা' তো আর এঁরা জানেন না। সে কথা অবিশ্যি ফাঁস করেন না বুকুর মা, ছেলের কথার ওপর ঝাপটা মেরে বলেন—কি শুনতে কি শুনিস হতভাগা ছেলে, যা হয় বললেই হলো?

ছেনুমাসী 'চালতা-চালতা' গাল ফুলিয়ে তালের মতো ক'রে গম্ভীরভাবে

বলেন,—আহা, তা' ছেলেকে গাল দিচ্ছ কেন নির্ম্মলা? সত্যিই তো অসময়ে এসে প'ড়ে কাজের ক্ষতি ক'রে দিলাম—

বুকুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন—কিছু না মাসীমা, কিছু না! এ সময়ে কোনো কাজ থাকে না আমার, এখন বিকেলবেলায় আবার এত কি কাজ? কিন্তু বুকু কথা শেষ করতে দেয় না, টপ্ ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে—বাঃ, কাজ নেই কি? এখনই তো গাদা গাদা কাজ! সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে না আমাদের? বাবা এলেই তো চলে যাবো, তাড়াতাড়ি রুটি-টুটি সব ক'রে নেবে না?

এত তাড়াতাড়ি কথা বলে বুকু, তাকে আর কথার মাঝখানে থামানো যায় না।

এরপর যদি বুকুর মা কালো ছেলের কান ম'লে লাল ক'রে ছাড়েন, দোষ দেওয়া যায় তাঁকে?

কান ম'লে দিয়ে মা ধমক দেন—যা, বেরো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ভূতে পেয়েছে না কি আজকে? সত্যি, এ ছেলেকে ধরে আছাড় মারলে রাগ যায়? তোমরাই বলো ছেনুমাসী? কেবল বানিয়ে কথা বলে।

বুকু চলে যেতে বুকুর মা ডাম্বলকে নিয়ে পড়েন।

—ওমা, ডাম্বল যে? দেখিনি এতক্ষণে। এত-বড় হয়ে গেছে? আর কী সুন্দর হয়েছে! বেণুমাসী, তোমার এই ছেলেটিই বোধহয় সব থেকে ফর্সা! তাই না?

একেই তো পরের কালো ছেলেকেও 'ফর্সা' বলা, বিচ্ছু ছেলেকে 'সোনা ছেলে' বলা নিয়ম তাছাড়া আবার নিজের ছেলের বেয়াড়া কথাগুলো ভুলিয়ে দেবার জন্যে বেশী করেই বলতে হয় বুকুর মাকে। নইলে, সত্যি কিছু আর ডাম্বল আহামরি ফর্সা নয়।

বেণুমাসী এবারে একটু প্রসন্ন হয়ে বলেন—না, ডাম্বল ত ছেলে-বেলায় ওই রকমই ছিল! এখন রোদে ঘুরে-ঘুরে—তা' তোমার বুকুও তো কালো হয়ে গেছে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

—আমার বুকু তো কালোই ছেলে।...তা'পর ডাম্বলবাবু, কি পড়তে-টড়তে শিখলে? ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছো না কি?

বেণুমাসী কি বলতে যাচ্ছিলেন, ডাম্বল তড়বড় ক'রে ব'লে ওঠে—কাঁচকলা! ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলে তো? আমার বাবাটি যে হাড়কেপ্পন! বলেন—'সাত বছরের ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা! পারবো না দিতে। প'ড়ে দরকার নেই, চাষবাস ক'রে খাবে!'

এবারে বেণুমাসীর মুখ চুন!

ছোট ছেলেদের সামনে যথেচ্ছ কথা বলার ফল টের পান। ছোট বোনকে সামলাতে ছেনুমাসী হি-হি ক'রে হেসে ব'লে ওঠেন—তোর ছেলেটা কি পাকা-পাকা কথা শিখেছে বেণু, শুনলে হাসি পায়। বাব্‌বাঃ, ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে!

ইত্যবসরে বেণুমাসী ধাতস্থ হয়ে উঠছেন।

তিনি বলেন—আজকালকার সব ছেলেই ওইরকম দিদি, এই এখ্‌খুনি দেখলে না, নির্ম্মলার ছেলে বুকু, ডাম্বলকে বই দু'খানায় একটু হাত দেওয়ার জন্যে কি রকম শাসালো? বলে কি না, 'যেমন হাতির মতো দেখতে, তেমনি হাতির মতো বুদ্ধি—সেজকাকা তোমার পিঠের ছাল তুলবেন— এই সব।

টেনে-টেনে হাসতে থাকেন বেণুমাসী।

শুনে তো বুকুর মা'র আক্কেল গুড়ুম!

হঠাৎ আজ কি হলো ছেলেটার, সত্যিই ভূতে-টুতে পেলো না কি? কই, এমন অদ্ভুত বেয়াড়া তো ছিলো না! কি আর করেন, প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন—সত্যি, এই ছেলেকে নিয়ে যে আমার কি জ্বালাই হয়েছে ছেনুমাসী, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। যত বড় হচ্ছে তত যেন যা-তা হয়ে যাচ্ছে। কে জানে, পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে না কি!

'পাগলা' বললে যদি দোষ খণ্ডায়।

ছেনুমাসীরা অবিশ্যি তেমন বোকা নয় যে, সহজ ছেলেকে 'পাগল' বললেই

তাই বিশ্বাস করবেন। মনে মনে ভাবেন.....মোটেই নয় তা'—বরং পাগল বানাতে পারে লোককে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তিনজনেই চমকে ওঠেন।

আর কিছু নয়; সেলফের ওপর থেকে টেবিল-ল্যাম্পটাকে ফেলে ভেঙে শেষ করেছে ডাম্বল।

এবারে আবার ছেনু-বেণু দুই বোনের অপ্রতিভের পালা, কিন্তু বুকুর মা 'হাঁ-হাঁ' ক'রে ওঠেন—আহা-হা, থাক্‌ বেণুমাসী, ছেলেকে আর বকতে হবে না। ছোট-ছেলে দুরন্ত হবে না একটু? মাটির পুতুলের মতন চুপ ক'রে থাকবে? ছট্‌ফটে ছেলেই আমার ভালো লাগে।

কাঁচ কুড়োতে-কুড়োতে বুকুর মা আরো বলেন—যে ছেলেরা ছোটবেলায় দুরন্ত থাকে, তারাই নাকি বড়ো হয়ে মহাপুরুষ হয়।

ছোটছেলে দুরন্ত হবে না একটু?

তারপর গল্প চলে।

যত সব মেয়েলি-গল্প আর কি!

'কার মেয়ের কোথায় বিয়ে হলো, কাদের বৌয়ের কি-কি গয়না হলো, শাড়ীর আজকাল কি-রকম জলের দর হয়ে গেছে, ছেনুমাসীরা তো আলমারি বোঝাই ক'রে ফেলেছেন শাড়ী কিনে-কিনে, বুকুর মা রাখছেন না কেন এইবেলা—' এই সব আলোচনা।

গল্প থামাতে হয়, বুকু আর বুকুর সেজখুড়ীমা দু'জনে মিলে অতিথিদের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আসেন। বড়-বড় রাজভোগ, ভালো-ভালো সন্দেশ, সিঙাড়া, নিমকি...

ছেনুমাসীরা 'খাবো না খাবো না' করেন—যেন ভয়ানক একটা কষ্টকর কাজ করছেন এইভাবে খেয়ে ফ্যালেন সবই, ডাম্বল গাঁউ-গাঁউ ক'রে সব-কিছু খেয়ে ফেলে, রেকাবীর থেকে রস চাটে ব'সে-ব'সে।

বুকুর মা বলেন—এই বুকু, তোর বাবা এসেছেন অফিস থেকে? বল্‌গে যা, মাসীমারা এসেছেন।

বুকু পট্‌ পট্‌ ক'রে বলে—এসেছেন, তা' বাবা খুব জানেন! সেইজন্যেই তো চটে-মটে লাল হয়ে ব'সে আছেন। বললেন—'খুব যা'হোক্‌ ছেনুমাসীরা বেড়াতে আসার আর দিন পেলেন না! আমাদের সিনেমার টিকিটগুলো পচাবার জন্যে—বেছেবেছে আজই আসতে ইচ্ছে হলো?'

হায়! হায়! কী করবেন বুকুর মা!

ছেলেকে চড় কসাবেন, না নিজেরই গালে-মুখে চড়াবেন? এ আবার কী ভীষণ শত্রুতা সুরু করেছে আজকে বুকু!

আর কি ব'লে মুখরক্ষে করবেন নিজের!

শুধু মনে ভাবতে থাকেন—এঁরা একবার উঠলে হয়; ছেলের হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই ক'রে ছাড়বেন।

শুধু হাত দিয়ে পেরে উঠবেন, না লাঠি-সোঁটা ধরবেন?

● "কি ক'রে বুঝবো"

শোনো শোনো গল্প শোনো

ছেনুমাসীরা বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তিতে বলেন—আচ্ছা, তাহ'লে উঠি নির্ম্মলা, তোমার অনেক ক্ষতি ক'রে গেলাম—

বুকুর মা কোন্-মুখে আর বলবেন—আবার একদিন এসো ছেনুমাসী। ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন বোকার মতো।

ডাম্বল জুতোর মধ্যে পা গলাতে গলাতে বুকুকে বলে—আমায় তো খুব বলা হচ্ছিল, তুই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিস্?

বুকু বুকটান ক'রে বলে—নিশ্চয়!

—কোন্ স্কুলে?

—'আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'!

—ক'খানা বই রে?

—সে অনেক। সব মিলিয়ে সাত-আটটা।...বাব্বাঃ, আর কত দেরী করবে তোমরা? যাও এবার? রাত্তির হয়ে গেল

বুকু বুকটান ক'রে বলে—নিশ্চয়!

যে। এখন মা কখনই-বা রান্না করবেন, আর কখনই-বা তোমাদের নিন্দে করবেন?

নিন্দে!...

ছেনুমাসীরা শুধু হার্টফেল করতে বাকী রাখেন।

আর বুকুর মা?

তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, হার্টফেল করেইছেন বুঝি-বা।

এবারে ডাম্বল ঘুঁষি পাকিয়ে আসে—নিন্দে কেন রে? নিন্দে কিসের?

—বাঃ, নিন্দে করা হবে না?...বুকু যেন অবাক হয়ে গিয়েছে, এইভাবে বলে—বেড়াতে-আসা লোকেরা চ'লে গেলে, নিন্দে করতে হয় না তাদের? বলতে হবে না—'ছেলেটা কি অসভ্য হ্যাঙলা—মাসীমারা কি অহঙ্কারী—এসে তো মাথা কিনলেন শুধু-শুধু একগাদা পয়সা খরচ হয়ে গেল—?'.....তাছাড়া—

বুকু এত তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, 'ধরলে কথা থামায় কে?' যা বলবার সবই ব'লে নেয় সে। তবু ওর 'তাছাড়া'-কে থামিয়ে দিয়ে ছেনুমাসী বলেন—বলো বাবা প্রাণ ভ'রে বলো—ব'লে গট্‌গট্‌ ক'রে চলে যান, পিছন-পিছন বেণুমাসী আর ডাম্বল।

আর ওঁরা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকুর মা রণচণ্ডী-মূর্ত্তি নিয়ে সুরু করেন ছেলে ঠেঙাতে। ঠেঙান্‌ আর চ্যাঁচান্‌—বল্‌ শয়তান ছেলে, কেন ও-রকম কথা বল্‌লি? বল্‌, বল্‌ শীগ্‌গির! মেরে তোকে মেরেই ফেলবো আজ।...তবু চুপ ক'রে আছিস্‌? কেন ওসব বল্‌লি যতক্ষণ না বলবি, মার থামাবো না আমি।... লক্ষ্মীছাড়া পাজী বাঁদর! লোকের সামনে চুনকালি আমার মুখে!

গোলমাল শুনে বুকুর বাবা এসে হাজির।

—কি, হলো কি, ছেলেটাকে বেধড়ক পিটোচ্ছো কেন?

—পিটোবো না? বুকুর মা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেন—পিটিয়ে ওকে তক্তা করবো আমি, জানো—ও কী করেছে আজ?.....

● "কি ক'রে বুঝবো"

শোনো শোনো গল্প শোনো

একে-একে ছেলের ভুতুড়ে-বুদ্ধির কথা বলতে থাকেন মা, আর শুনতে-শুনতে বুকুর বাবা রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। তখন তিনিও লেগে গেলেন প্রহারে।

সত্যি, যে ছেলে মা-বাপকে এ-ভাবে বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ ক'রে ছাড়ে, তাকে মেরে 'তক্তা' ক'রে ফেললেই কি রাগ মেটে?

দু'জনে মিলে চ্যাঁচান্—বল্, বল্, কেন ওসব বল্‌লি?

বুকু অনেকক্ষণ গোঁ-ভরে চুপ ক'রে মার খাচ্ছিলো, আর পারে না। ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বলে—নিজেই তো দুপুর-বেলা একশো বার ক'রে বললে, 'সব-সময় সত্যি কথা বল্‌বি, কারুর কাছে কিছু লুকোচুরি কর্‌বি না' এখন আবার নিজেই মারছো! কি ক'রে বুঝবো, আসলে কি করতে হবে?

ছেলেটাকে বেধড়ক পিটোচ্ছো কেন? [পৃষ্ঠা ১০

মুষ্টিযোগ

—দূর ছাই, আর পারা যায় না বাবা! যা থাকে কপালে—

বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে ব'সে থাকতে-থাকতে হঠাৎ সশব্দে স্বগতোক্তি ক'রে উঠে দাঁড়ান আশু বিশ্বাস।

সত্যি, আর পারা যায় না-ই বটে, কী চলছে আজকাল! মানুষগুলোকে নিয়ে যেন ডাংগুলি খেলা হচ্ছে। সুরু তো হয়েছিল সেই হতচ্ছাড়া যুদ্ধ থেকে। যাক্, সব উপদ্রবই তো একরকম সয়ে যাচ্ছিলো—কিন্তু বছর-খানেক থেকে এ কী উপদ্রব সুরু হয়েছে বলো দিকিন? চিরদিন জানা ছিল, পথ চলতে গেলে সামলাতে হয় আমাদের কাছা-কোঁচা-মনিব্যাগ, বড় জোর—ছাতা! আর, এখন? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মাথা সামলাতে সামলাতে পথ চলা!

নিমেষের মধ্যে কখন যে ধড় থেকে মাথাটি আলাদা হয়ে যাবে কে জানে বাবা! তারপরে হয়তো দু'-পাঁচ দিন পরে—সেই হারানো মাথাটা খুঁজে পাবে পার্কের কোণে,

কি ডাষ্টবীনের মধ্যে, কিংবা হাইড্রেনের ভেতর। মানে, তুমি কি আর পাবে? তোমার আত্মীয়-স্বজন। নয়তো কেউ পাবে না...লৌকিক জগতের ঊর্দ্ধ্বে উঠে গিয়েও যদি তোমার অক্ষর-জ্ঞান বিলুপ্ত না হয় তো ঊর্দ্ধ্বলোক থেকে দেখবে—'যুগান্তরে' আর 'আনন্দবাজারে', 'ভারতে' আর 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে' রোজ তোমার নাম ছাপা হচ্ছে।...কী রঙের জামা ছিল তোমার গায়ে, সর্ব্বাঙ্গে ক'টা তিল আর ক'টা জড়ুল ছিল, লম্বা কী বেঁটে, কালো না ফরসা, দাঁত উঁচু কি নাক খ্যাঁদা ইত্যাদি ইত্যাদি।...

কিন্তু ঊর্দ্ধ্বলোক থেকে সব-কিছু দেখতে পাওয়াটা সুবিধে হলেও কে আর তেমন পছন্দ করে বলো? কাজেই পথ চলতে গেলেই সব সময় যেন ঘাড়টা শির্‌শির্‌ করতে থাকে। নিতান্ত প্রাণের দায় না পড়লে প্রাণটা হাতে ক'রে বেরোবার সখ হয় না। বিশেষতঃ আশুবাবুর মতো যারা বিশেষ সম্প্রদায়ের পাড়ার কাছে বাস করে।

অথচ আশু বিশ্বাস মোটা মানুষ, ভুঁড়ির ঘরে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখে ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল—"হাঁটবেন, খুব হাঁটবেন, দৈনিক অন্ততঃ এক মাইলও হাঁটবেন, নচেৎ দৈনিক এক ছটাক মেদ বৃদ্ধি অবধারিত।"

সেই আশু বিশ্বাস আজ বছর-খানেক ধ'রে প্রায় বাড়ীতেই বসে আছেন। সত্যি ক'দিনই বা বেরোলেন? পয়সা আছে, চাকর-বাকর আছে, পেটের দায়টা নেই, যা কিছু জোগাড়—ওরাই ক'রে আনে, ব্যাঙ্ক থেকে চেক্‌ ভাঙিয়ে আনা পর্য্যন্ত। অতএব আশুবাবুর দৈনিক এক ছটাক ক'রে মেদ বেড়েই চলেছে।

হ্যাঙ্গাম তো এক রকমের নয়। শুধুই কি মাথার ভাবনা? কারফিউ নেই?

'মর্নিং ওয়াক্‌' আর 'ইভনিং ওয়াক্‌' যেটা স্বাস্থ্যবিধির বিধান, তার দফাই তো গয়া! সেই অমূল্য সময়টুকু ঘরে বন্ধ হয়ে থাকো ব'সে। ঈজি-চেয়ারে ব'সে থাকতে থাকতে অঙ্ক ক'ষে দেখছিলেন আশুবাবু, কতো ছটাক ওজন বেড়ে গেছে তাঁর ভুঁড়ির, এই বছর-খানেকের মধ্যে।

আধ-প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস হয়ে গেল, মাথা গরম হয়ে উঠলো—ভেবে

কূলকিনারা পেলেন না ভদ্রলোক। তলে তলে এই পর্ব্বত সৃজন হ'চ্ছে তাঁর দৃষ্টির অগোচরে।

—যা থাকে কপালে...ব'লে উঠে পড়লেন আশু বিশ্বাস। নাঃ, আজ তিনি বেরোবেনই। শুধু আজ নয়—যতদিন না ভালো-মন্দ কিছু হ'চ্ছে ততদিন রোজ। দৈনিক দু'মাইল ক'রে হেঁটে...দৈনিক জমা তো বটেই—পুরনো ষ্টকও খালি ক'রে ছাড়বেন। গোয়ালন্দের তরমুজের মতো এই ভুঁড়ি ফাঁসাবার সাহস কারুর থাকে, ফাঁসাক। পৃথিবীতে একটা স্থাবর সম্পত্তি হয়ে বেঁচে থাকবার বাসনা তাঁর নেই আর।

জামা প'রে, জুতো প'রে, ট্যাঁক্-ঘড়িটি নিয়ে সবে ছাতাটি খুঁজছেন, আর নীচের তলা থেকে ভূতে-পাওয়ার মতো ছুটে এলো ছোঁড়া চাকর, ভূতো।

—বাবু গো—গুণ্ডো!

—গুণ্ডো কি রে ব্যাটা...গুণ্ডো কি?

—গুণ্ডো গো বাবু, গেলেই দেখতে পাবেন।

—বলি, কোথায় সে?

—নীচের তলায় গলির দরজা দিয়ে ঢুকেছিল।

—ঢুকেছিল?

আশুবাবু আশ্বস্ত হয়ে বলেন—চ'লে গেছে তো?

—চ'লে যাবে? ঈস্! গেলেই হ'ল আর কি! মামাতে আর ঠাকুরেতে এ্যায়সান্ জাপ্টে ধরেছে, বাছাধনের আর নড়বার ক্ষমতা নেই।

আশুবাবু হাঁস-ফাঁস করতে করতে গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলে বলে ওঠেন—বলি, ভালো করে দেখেছিলি তো? হাতে কোনো অস্তর-টস্তর...?

এতক্ষণে ভূতো ফিক্ ক'রে হেসে ফ্যালে—না বাবু, সে-সব কিছু নেই, গুণ্ডো হ'লে কি হবে, নেহাৎ নিরীহ বেচারা...ঠাকুরের পায়ে ধ'রে মা-কালীর দিব্যি করছে।

আশুবাবু সন্দেহযুক্ত স্বরে বলেন—কিসের দিব্যি?

—ওই যে বলছে—লুঙ্গি-ফুঙ্গি সব ছল, আসলে জাত বামুনের ছেলে।

আশুবাবু কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বললেন—পৈতে দেখাতে বললি না কেন?

—বলেনি আবার? মামা কি কম সেয়ানা? তা' বললে—জামার সঙ্গে 'ডাইংকিলিঙে' গেছে পৈতে।

—চ' দি কি ন দেখি।

সাহসে ভর ক'রে নীচে নামতে থাকেন আশু বিশ্বাস।

তখন ঠাকুর আ র গ জা—অ র্থা ৎ ভূতোর মামা, সেই ভয়াবহ জী ব টি কে কতকটা মুক্তি দিয়েছে ...মানে, হাতটা ধরে রেখেছে শক্ত ক'রে—'শাট্টে-পাট্টে' ধরাটা ছেড়েছে।...তবে অতটা করবার কিছুই ছিল না। তার যা আকৃতি, তাতে একলা ভূতোই সামলাতে পারতো।

বলি, ভালো ক'রে দেখেছিলি তো? [পৃষ্ঠা ১৪

আশুবাবু মিনিট-খানেক নিরীক্ষণ ক'রে দেখে হঠাৎ চমকে উঠে বলেন—'ক্যাবলা!' ক্যাবলা নামধারী ভদ্রলোক ছিটকে আসে একেবারে আশু বিশ্বাসের

পায়ের কাছে।...প্রায় বুকফাটা আর্ত্তনাদের মতো শোনায় তার কণ্ঠস্বরটা—বিশ্বাস মামা গো, খুন ক'রে ফেলেছিল একেবারে! বাড়ীর মধ্যে দু'দুটো দুশমন পুষে রেখেছেন মামা? উঃ, ঘাড়টার রাখেনি কিছু...এমন রদ্দা মেরেছে! গুণ্ডা, গুণ্ডা, পয়লা নম্বরের গুণ্ডা!

আশু বিশ্বাস সন্দিগ্ধভাবে বলেন—তা' তোমার বেশভূষাগুলোও তো বিশেষ ভালো ঠেকছে না বাপু?

ক্যাবলা কাতর নিঃশ্বাসের সঙ্গে হতাশভাবে বলে—'টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুল-তলায় বাস'—এ হ'ল তাই। ভাবলাম, বেপাড়া দিয়ে যাওয়া... সাজটা পাল্টে নিই, সেই সাজই আজ 'কাল' হ'ল আমার।

—তা যেন হ'ল...আশু বিশ্বাস গম্ভীরভাবে বলেন—আমার বাড়ীর উঠোনটা তো সরকারি রাস্তা নয় বাপু? হঠাৎ গলির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়াটা তো খুব পরিষ্কার ঠেকছে না!

—মাপ করবেন বিশ্বাস মামা, কথাটা হ'চ্ছে—পরিষ্কার হবে কোথা থেকে? ফ্যাটি লোকদের ব্রেনটা সাধারণতঃ একটু কম পরিষ্কার হয় কি না? যাকে আর কি 'মাথা মোটা' বলে। পেছনে যদি কেউ ছুরি উঁচিয়ে তেড়ে আসে...হিতাহিত জ্ঞান থাকে?

আশুবাবু শিউরে উঠে বলেন—তাই নাকি?

—তবে? তবে আর বলছি কি? দরজায় 'নেম প্লেটে' 'এ, টি, বিশ্বাস' দেখে বিশ্বাস ক'রে ঢুকে পড়লাম। ভদ্রলোকের বাড়ী ভেবেই ঢুকে পড়েছি, তখন তো জানি না মামা, আপনার বাড়ী এটা। হায় ভগবান! এখন দেখছি ছুরি বরং ভালো ছিল আমার, একেবারে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো! উঃ, এ যা দু'টি বুল্‌ডগ পুষেছেন বাড়ীতে—

এইখানে ব'লে রাখা ভালো—তোমরা যারা একটু হুঁশিয়ার পাঠক, তারা হয়তো ভাবছো, জাত বামুনের ছেলে আবার আশু বিশ্বাসের ভাগ্নে হয় কি ক'রে? আসলে কিন্তু ভাগ্নে-টাগ্নে নয়, গ্রাম-সম্পর্কে মামা। দেশের পুরুত নবীন ভট্‌চাজের নাতি—ক্যাবলা।

শোনো শোনো গল্প শোনো

আশুবাবু একটা উপুড়-করা গামলার ওপর ব'সে রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রুদ্ধশ্বাসে বলেন—ক'জনে তাড়া করেছিল?

—তা জন আষ্টেক হবে মামা। বলবো কি, তাদের চেহারা দেখলেই আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যায়। আসছি...দেখি, দৈত্য-দানোর মতো ছুটে আসছে একখানা জীপ-গাড়ী। গাড়ী না গাড়ী অতো আর তাকাইনি—হঠাৎ গলির মোড়ের কাছে আসতেই সেই চলন্ত গাড়ী থেকে টপাটপ ক'রে নেমে প'ড়ে ব্যাটারা খেঁকিয়ে উঠে বললে—এই, তোর নাম কি?... পরনে লুঙ্গি, মাথায় ফেজ—তবু সন্দেহ, বুঝুন?...চিরদিনের অভ্যেস—নাম জিজ্ঞেস করতেই ব'লে বসেছি, 'কেবলরাম চক্রবর্ত্তী—' আর যায় কোথা, আটখানা ছোরা নিয়ে আট দিক থেকে তেড়ে এলো... ভাবছেন, পালিয়ে এলাম কি ক'রে? ওই যে কথায় আছে—রাখে কেষ্ট মারে কে! সাত পা পিছিয়ে, তিন পা এগিয়ে ক'ষে দিলাম এক

উপুড়-করা গামলার ওপর ব'সে রুমাল দিয়ে হা

লাফ।...ব্যস্, একেবারে রাস্তার ও-ফুটপাত থেকে একেবারে আপনার পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ীর ভেতর।

আশুবাবু নিজের উঠোনের প্রায় দু'মানুষ-ভোর পাঁচিলটার কথা স্মরণ ক'রে সন্দিহান গোছের হয়ে বলেন—অত উঁচু পাঁচিল একলাফে টপ্‌কানো যায়?

—যায় না তো, গেল কি ক'রে? ক্যাবলা উপহাসের মতো হাসি হেসে ওঠে—আপনাদের পক্ষে হয়তো রূপকথার গল্পের মতো, কিন্তু ক্যাবল শর্ম্মার কাছে এ পাঁচিল কতোই আর? ওয়ার্লডের মধ্যে নাম-করা হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান কে, চক্রবর্ত্তীর কাছে ও কিছুই নয়, নেহাৎ নাকি বিপদে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়ে পড়েছিলাম, তাই ভাবছি কি ক'রে পড়লাম।...তবে ওই যে বলে না, অভ্যাস? মরে গেলেও মানুষ অভ্যাস ভোলে না।

ততক্ষণে ভূতো বড়োসড়ো হাঁ ক'রে থেবড়ে বসেছে, ভূতোর মামা গদাই বসেছে কাছে উঁচু হয়ে। ঠাকুরের নাকে রান্নাঘর থেকে ভাত পোড়ার সুগন্ধ এসে লাগছে ব'লে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গল্পের গন্ধটা বোধ করি বেশী আকর্ষণকারী ব'লে যেতে পারছে না।

আশু বিশ্বাস অবাক হয়ে বলেন—কে, চক্রবর্ত্তী কি তুমিই নাকি?

—তবে? আমি ছাড়া আর ক'টা চক্করবর্ত্তী হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান আছে, বলুক তো এসে? তবে, হ্যাঁ গরীবের ছেলে ব'লে যদি অবিশ্বাস করেন সে আলাদা কথা।

বিশ্বাস মশাই অপ্রতিভ হয়ে বলেন—না না, অবিশ্বাসের কি আছে? তবে তোমার এই পট্‌কা চেহারায় এতো দৌড়ঝাঁপ করতে—

কথা শেষ করবার আগেই হো হো ক'রে হেসে উঠে ক্যাবলা...

কিছু মনে করবেন না মামা,—তবে কি আপনার মতো—ইয়ে—মোটকা চেহারা হলেই সুবিধে হতো? দোষ নেবেন না মামা, আপনার মতো অবস্থা হ'লে আমি কোন্ কালে সুইসাইড্ করতাম!

আশুবাবু হতাশভাবে বলেন—সে তো আমিও করতে প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

আর একমিনিট আগে পথে বেরুলে, জীপ্ গাড়ীর ওরা তোমায় ছেড়ে হয়তো আমাকেই—

হঠাৎ শিউরে উঠে থেমে যান আশুবাবু। আটখানা ছোরা মনে করেই তাঁর বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।...কারই বা না আসে? যে জীবনে বীতরাগ হয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, তারও আসে।

ক্যাবলা সহানুভূতির স্বরে বলে—সত্যি মামা, আপনার অবস্থা দেখলে চোখে জল আসে, তবে এর ওষুধ আমি জানি...একদিনে অর্দ্ধেক ওজন কমিয়ে দিতে পারি আমি। কিন্তু আপনি কি রাজী হবেন?

—রাজী হবো না মানে? বলো কি? শুনি তোমার ওষুধ।

—দাঁড়ান্ অতো চট্‌পট্ কি হয়?...কিন্তু বাড়ীতে আর কাউকে দেখছি না কেন্ বলুন তো?

—সব কাশী গেছে। সবাইকে নিয়ে ঝামেলা ভালো লাগেনা, দিয়েছি পাঠিয়ে। সে যাক গে, তোমার ওষুধটা শুনি?

—নাঃ, মামা দেখছি একটি ব্যস্তবাগীশ! সে কি খাবার ওষুধ? না, মালিশ করবার? স্রেফ একটা কায়দা, মানে আর কি, কৌশলের ব্যাপার।...ইয়ে...মুষ্টিযোগও বলতে পারেন।

আশুবাবু বিজ্ঞভাবে বলেন—জানি আমি, শুনেছি ওই ধরণের একটা চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, প্রাণায়ামের জোরে হুপিংকাশি সারানোর কথাও শুনেছি আমি।

—তবে আর কি, জানেন তো সবই, শুধু জেনে শুনে বুড়ো পাগল। আচ্ছা, আমি আপনার ভার লাঘবের ভার নিচ্ছি।...কিন্তু তার আগে বাবা ঠাকুরচন্দর! গরম গরম এক পেয়ালা চা খাওয়াও দিকিন...বরং একটু আদা দিও। উঃ, এ্যায়সান্ রদ্দা মেরেছো, ঘাড় এখনো টন্‌টন্ করছে।

আশুবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন—শুধু চা কেন? ইয়ে...দু'চারখানা লুচি-টুচি?...সত্যি ঠাকুর, যাকে তাকে এভাবে মারধোর করা—

—যেতে দিন, যেতে দিন মামা, বেচারা লজ্জায় মাথা তুলতে পাচ্ছে না, কিন্তু

শোনো শোনো গল্প শোনো

এখন আর অবেলায় দু'চারখানা লুচি কেন? একেবারে সন্ধ্যে হ'লেই আহারে বসা যাবে অখন, তুমি শুধু ওই চা-ই দাও ঠাকুর। নেহাৎ না ছাড়েন দু'খানা বিস্কুট ফিস্কুট—

মুখের কথা খসাতে না খসাতে ভূতো ঊর্দ্ধশ্বাসে ওপরে উঠে গিয়ে বাবুর ঘর থেকে বিস্কুটের টিন এনে হাজির।

—এ ছোঁড়াটা মন্দ নয়, কিন্তু এই যে দুটি পুষেছেন মামা, একেবারে বিচ্ছু। অবিশ্যি ওদেরও দোষ নেই, ধরুন আমি না হয়ে যদি সত্যিই কোনো বদলোক হ'ত!... কই দে ততক্ষণ বিস্কুট দু'খানাই চিবোই, চা আনতে ঠাকুর বুড়ো হয়ে গেল!...ঘাড়টা খ'সে যাচ্ছে যেন!

আশুবাবু ব্যস্ত হয়ে আর একবার চায়ের জন্যে হাঁক দেন।

ঠাকুর চা আনতেই হেঁসেলের আইটেম্‌গুলো জেনে নেয় ক্যাবলা, এবং জেনে নিয়েই নাক সিঁটকে বলে—আরে, ছোঃ, এই রান্না? রাজা মানুষ মামার বাড়ী এসে খাবো কিনা, কাঁচা পেঁপের ডাল্‌না, মাগুর মাছের ঝোল আর রুটি! ছ্যা ছ্যা...

ঠাকুর সবিনয়ে জানায়, বাবুর ভুঁড়ির জন্যেই তাদের সুদ্ধ এই কৃচ্ছ্রসাধন।

—আরে বাপু, আমার তো আর তোমার বাবুর মতো 'ইয়ে' নেই। খেলোয়াড় মানুষ—খাওয়া-দাওয়াগুলো ভালো না হ'লে চলে না আমার, সকালে স্রেফ মাংসের ঝোল আর ভাত, আর রাত্রে ডিম ভাজা আর ভালো মাছের কালিয়ার সঙ্গে লুচি কিংবা ঢাকাই পরোটা—ব্যস্, হাবিজাবি কতকগুলো খাবোই বা কেন?

আশুবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন—রোজ লুচি মাংস ডিম খেয়ে হজম করতে পারো তুমি?

—পারবো না কেন? দিব্যি পারছি, শুধু দাদামশায়ের কানে না তুললেই হ'ল, বুড়োর ধারণা, ডিম মাংস খেলেই জাত-ধর্ম্ম গেল...যতো সব সেকেলে কুসংস্কার আর কি!

কথাটা মিথ্যে নয়, ওসব সেকেলে কুসংস্কার ছাড়া আর কি? কিন্তু আশুবাবুর তো ওসব সেকেলে কুসংস্কার নেই, বিশ্বাসঘাতক ভুঁড়ির নৃশংসতায় লুচি

মাংসের স্বাদই ভুলে গেছেন তিনি, তাই করুণ সুরে বলেন—তোর ওষুধটা আমায় বাৎলে দে ক্যাবলা।

ক্যাবলা আশ্বাসের সুরে বলে—দেবো মামা দেবো, গোটাকয়েক মুষ্টিযোগ—ব্যস্। কাল সকাল থেকেই আপনি ওষুধের ফলাফল টের পাবেন, কিন্তু আমার আজকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা মামা—?

—তার জন্যে ভাবতে হবে না, সে সমস্ত ঠাকুর ঠিক ক'রে দেবে।

ঠাকুর অপ্রসন্নভাবে বলে—ডিম কোথায় পাবো এখন, বাজারে কে যাবে? জীপ্-গাড়ী ঘুরছে না?

ভূতো ব্যস্ত হয়ে বলে—কেন পার্ব্বতীয়ার মার কাছে গেলেই পাওয়া যায়। গাদা গাদা হাঁস পুষেছে না ও? পাড়ার সব্বাই ডিম নেয় যে ওর কাছে।

পেঁপের ডালনা কুটে নিয়ে আজকের মতো নিশ্চিন্ত ছিল ঠাকুর, তাই রোষকষায়িত নেত্রে বলে—তবে যা তুই, হাতির ডিম, ঘোড়ার ডিম যা পাবি নিয়ে আয়।

—আমি গিয়ে কি করবো?...ভূতো নিশ্চিন্তভাবে কৌশলে সংগৃহীত বিস্কুট দু'খানায় কামড় দিতে দিতে বলে—আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে তবে ঠকাক্ আর কি—যা শয়তান বুড়ি! মামা যাক্ না!

শেষ পর্য্যন্ত মামাই যায় ভূতোর।

ডিম আনে—আলুর দম, পটল ভাজা, লুচি, চাটনি, দই, কিছুরই ত্রুটি হয় না, শুধু মিষ্টি পাওয়া যায় না বাজারে—না যাক। ক্যাবলা অতো মিষ্টি-ফিষ্টির ধার ধারে না। যে যদি বলো—তার দাদামশাই নবীন ভটচাজ, মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে রসগোল্লা দিলে খায়।

দোতলায় নিজের পাশের ঘরেই ক্যাবলার শোবার ব্যবস্থা ক'রে দেন আশুবাবু। না দেবেনই বা কেন? যতোই হোক দেশের ছেলে, পুরুতের নাতি, তার একটা সম্ভ্রম আছে তো?

তা' ছাড়া—ওজন হ্রাস করবার যে প্রক্রিয়াটা—রাত্রেই প্রশস্ত কি না সেটা... অবিশ্যি বিশেষ প্রক্রিয়া আর কি, সামান্য কয়েকটা মুষ্টিযোগ। মানে—মাথার

শোনো শোনো গল্প শোনো

বালিশের তলা থেকে আলমারির চাবিটা হাতড়ে নেবার সময় আশুবাবু যখন বাধা দিতে গিয়ে হাঁসফাঁস ক'রে উঠেছিলেন—সেই সময় তাঁর সুডোল নাসিকাটির সঙ্গে ক্যাবলার শির-বার-করা হাতের খট্‌খটে মুষ্টির যোগাযোগ হয়েছিল বার কয়েক।

বেশী নয়।

আশুবাবুর মতো 'শাঁসেজলে' লোকের জন্যে বেশী দরকার হয় না।

তারপর?

সকালবেলা উঠে দেরাজ-আলমারি আর ট্র্যাঙ্ক-সুটকেশের মধ্যস্থিত বস্তুর ঘাটতির বহর দেখে চুপ্‌সে যেতে আরম্ভ করেছেন আশুবাবু। ভুঁড়ি তো দূরের কথা, বুক পিঠ হাত পা সবই ছোট হয়ে যাচ্ছে...রবারের বেলুন বাঁশি কিনে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলে যেমন আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায় তেমনি।...শুধু নাকটাই যা বেড়েছে বেশ কিছু।

তা, জোরালো ওষুধের ক্রিয়াটা তো সব সময় একরকম নয়! কিছু উপসর্গ কমে, কিছু বা বাড়ে।...

গিন্নী আর বৌমাদের শূন্য গয়নার বাক্সগুলো দেখিয়ে কি জবাবদিহি করবেন তাই ভেবে ভেবে দৈনিক এক পাউন্ড ক'রে ক'মে যাচ্ছেন আশুবাবু।

বামুনঠাকুর বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে আড়াল থেকে নিজস্ব ভাষায় যা বলে তার অর্থ এই হয়—"হবে না? হবেই তো, ঠিক হয়েছে। লুঙ্গি-পরা গুণ্ডাকে জামাই-আদরে হাঁসের ডিমের ডালনা খাইয়ে দোতলায় নিয়ে গিয়ে শোওয়া! এতোখানি বয়সে নরহরি ঠাকুর এমন ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড কখনো দেখেনি।"

গদাইও বাবুর কানে যেতে পারে এমন সুরে ভূতোকে ডেকে বললে,—দেখলি তো ভূতো, সেবারে বাবুর আংটিটি হারালো—একেবারে পুলিশের ডাইরী-টাইরী কতো কাণ্ড! কী লাঞ্ছনা আমাদের ওপর। আর, এই দেখ্, যথাসর্ব্বস্ব গেল—থানা-পুলিশের নাম নেই বাবুর মুখে।

নেই সেকথা সত্যি, কিন্তু আশুবাবুর বিবেকই যে তাঁর হাত-পা বেঁধে রেখেছে। শোবার সময় ক্যাবলা তো বারবার বলেছিল—"দেখবেন মামা, সহ্য করতে

পারবেন তো? এ চিকিৎসাতে একটু কিন্তু কষ্ট আছে, শেষে যেন দুষবেন না আমায়—"

তিন-আষ্টে চব্বিশবার সত্যি করেছেন আশুবাবু দুষবেন না বলে।

রোগটা যে সারিয়েছে ক্যাবলা সেকথা তো অস্বীকার করবার যো নেই?

দৈনিক একবার ক'রে টেপ্ নিয়ে জরিপ ক'রে দেখছেন তো ভুঁড়িটা।

আর, শুধুই কি তাই? বিবেকের দংশনও কি আর নেই?

এতো টাকার মালিক হয়ে জীবন-ভোর কেবল নিজের খাতেই ব্যয় ক'রে এলেন সর্ব্বস্ব। একটা সৎকাজে একটা টাকা ব্যয় করেছেন কখনো? এই যে সেবার আশু বিশ্বাসদের গ্রামে হাসপাতাল বসালো সবাই চাঁদা তুলে, ট্রেণ ভাড়া খরচা ক'রে পাড়ার ছেলেরা এসে চাঁদা চেয়ে-চেয়ে হন্যে হয়ে গেল—দিয়েছিলেন এক পয়সা?

বেশী কথা কি, নাইট-স্কুল খুলবে ব'লে তাঁর বাড়ীর একটা ঘর খুলে দিতে বলেছিল—তাই কি রাজী হয়েছিলেন? অথচ তালাবন্ধ পড়েই তো আছে বাড়ীটা...

বন্যা...দুর্ভিক্ষ...দাঙ্গাদুর্গত...আজাদ হিন্দ দল...নানা প্রতিষ্ঠানের চাঁদার খাতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে...কিন্তু কই, এ, টি, বিশ্বাসের স্বাক্ষর কোথায়? কোথাও না।...

সাধে কি আর বলে—'কৃপণস্য ধনং হরে--বহ্নি পৃথিব তস্করে!' ক্যাবলার মুষ্টিযোগে কেবল ভুঁড়ির বিলয় হচ্ছে—তা তো নয়--চৈতন্যেরও উদয় হ'চ্ছে যে! থানা-পুলিশ আর করেন কোন্ লজ্জায়?

সমঝদার

—এই আবার সুরু হ'লো ঘ্যানঘ্যানানি? বন্ধ কর্ বাবা, বন্ধ কর্—অসহ্য!...বল্‌তে-বল্‌তে সেজমামা নিজেই তেড়ে এসে, 'কড়াৎ' ক'রে কানটা মুচড়ে (না, আমার কান নয়, রেডিওটার) থামিয়ে দেন ঘ্যানঘ্যানানি।

আমি আর্ত্ত-স্বরে বলে উঠি—ও কি সেজমামা, ও কি! সরোজ মল্লিকের গান হ'চ্ছে যে!

শোনো শোনো গল্প শোনো

—আরে, রেখে দে বাবা তোদের সরোজ মল্লিক আর বসন্ত মুখুয্যে। শুনলে, হাড়-পিত্তি জ্বলে যায় আমার।

আমি বিস্ফারিত চক্ষে বলি—কি বলছো গো সেজমামা, এইমাত্র তেতাল্লিশ জনের নাম পড়া হ'লো রেডিওতে, শুনলে না? ওই তেতাল্লিশ জনের অনুরোধে সরোজ মল্লিকের এই রেকর্ডখানা বাজানো হচ্ছিলো যে...

—কি বললি?—সেজমামা একবার নিজের মুখটা তুলে চশমার নীচের দিক থেকে, একবার চশমাটা নাকের নীচে নামিয়ে ওপর দিক থেকে, শেষ পর্য্যন্ত চশমাটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে, সাদা-চোখে আমাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে গম্ভীরভাবে বললেন—কী বললি? মেয়ে-মদ্দ ছেলে-বুড়োয় তেতাল্লিশ জনে মিলে ওই রাবিশ গানখানা—

চশমাটা নাকের নীচে নামিয়ে.....বললেন—কী বললি?

পোস্টেজ খরচা দিয়ে অনুরোধ ক'রে-ক'রে শুনতে চেয়েছে? তাই বললেই বিশ্বাস করবো আমি?

ছোড়দি আর থাকতে পারে না, বেশ ঝেঁজে উঠে বলে—তবে কি তুমি বলতে চাও সেজমামা, ওরা এই এতক্ষণ সময় খরচা ক'রে যে নামগুলো পড়লো, সব বাজে?

সরোজ মল্লিকের মাষ্টার পীস এই গানখানার এ-রকম অপঘাত-মৃত্যুতে ছোড়দি যে রীতিমতো চটে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি! তেতাল্লিশ জনের মধ্যে ওর নামটাও ছিল যে!...সেজমামা নিজে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, আর তো তাঁর নাকের সামনে 'কড়াৎ' ক'রে খুলে দেওয়াও যায় না! যতই হোক, একে গুরুজন, তাতে আবার আমাদের বাড়ীর অতিথি। কয়েকদিন থাকবেন ব'লে এসেছেন দয়া ক'রে। আসবার আগে মা তো 'পই-পই' ক'রে শাসিয়ে রেখেছেন আমাদের, যেন সেজমামাকে কোনো ভাবেই বিরক্ত বা অপদস্থ না করি। আমাদের নাকি গুরু-লঘু জ্ঞানটা কম, তাই মা'র এত সাবধানতা।

আচ্ছা, শুধুই তাই কি? মা'র নিজের ভাইটিও একটু কেমন-কেমন 'উদো-মাদা'-গোছের বলেই না এতো ভাবনা! মা অবশ্য তা মানেন না, কিন্তু আমরা তো ঠিক বুঝি। কারণ, আমাদের—জানি না সত্যি কি না—গুরু-লঘু জ্ঞানটা কম হলেও, সাধারণ জ্ঞানটা কিছু আর কম নয়। ছোড়দির তো আবার নিজের বুদ্ধিতে অগাধ আস্থা।

ছোড়দির ঝাঁজালো প্রশ্নে সেজমামা কিন্তু মোটেই থতমত খান্ না, বেশ আত্মস্থ ভাবেই বলেন—তা আবার জিগ্যেস করছিস? বিলকুল বাজে—বুঝলি? বিলকুল বাজে। কি করবে, সময় কাটানো চাই তো? দিনে তিনবার ক'রে কতো সাপ-ব্যাঙ-মাছ জোগাড় করবে? ওই টেলিফোন-ডাইরেক্টরী একখানা খুলে ধ'রে যা খুশি নাম-ঠিকানা প'ড়ে যায় গড়্‌গড়িয়ে। কে তদন্ত করছে সত্যি না বাজে—হুঃ! তবু তো খানিক সময় কাটলো ওদের।...তারপর ওই নাকী-কান্নার সুরে গাওয়া খানকতক রেকর্ড মজুত থাকে ঘরে, দিলে চাপিয়ে পর পর। ব্যস্! ট্যাঁ-ফোঁ করবার জো নেই তোমাদের—তেতাল্লিশ জন মিলে ধর্ণা দিয়েছে ওই কান্না শোনবার জন্যে! চাও কিছু আর?

শোনো শোনো গল্প শোনো

—বলছো বটে সেজমামা—(আমি মা'র শাসন স্মরণ ক'রে সসঙ্কোচে বলি)—সরোজ মল্লিকের গানের নিন্দে করছো শুনলে, বাংলাদেশ সুদ্ধ সকলে তোমায় 'ছি-ছি' করবে কিন্তু।

—বাংলাদেশ কেন, 'আ-পাকিস্তান ভারতবর্ষ' এক জোটে 'ছি-ছিকার' করুক না, বয়ে গেল আমার। আমার যা বলবার আমি বলবোই, বুঝলে হে বাপু?

—আসল কথা, তুমি গান ভালোবাসো না, তাই বলো—ভারী-মুখে মন্তব্য করে ছোড়দি।

বোধহয়, 'গান আর ফুল যারা ভালোবাসে না তারা যে অনায়াসে খুন করতেও পারে' এইরকম একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলো—(অন্ততঃ আমার তাই মনে হ'লো ছোড়দির মুখ দেখে)।

বাধা দিয়ে সেজমামা জোর গলায় ব'লে ওঠেন—কেন ভালোবাসবো না? আলবৎ বাসি! গাইয়ের মত গাইয়ের গলায় গানের মত গান হ'লে, আহার নিদ্রা ভুলে যেতে পারি তা জানিস?

ছোড়দি আর আমি একটু তাকাতাকি করি, অবশ্য নেপথ্যে। সেজমামার আহার-নিদ্রা বিস্মরণ! সে-রকম গাইয়ে আর সে-রকম গান এ-পৃথিবীতে মিলবে কি? খুব সম্ভব, দেবরাজ ইন্দ্রের ভাঁড়ার খুঁজতে হবে।...তবু মরিয়া হয়ে বলি—সে-রকম একটা গাইয়ের নাম করো না শুনি? যখুনি যার গান হয়, তখুনি তো—

—হ্যাঁ, তখুনি আমার ইচ্ছে করে, রেডিওটাকে ধ'রে কান মলে ঠাণ্ডা ক'রে দিই। কি করবো বল, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে তো? দিন-দুপুরে সাঁজ-সকালে, যখন-তখন ঘ্যানর-ঘ্যানর নাকী-সুরে হা-হুতোস্মি সহ্য হয়? বরং তোদের ওই 'আধুনিকের' চাইতে 'রামধুন'ও ভাল।

—বাঃ, আজকাল যে ওই রকম গানেরই চলন হয়েছে সেজমামা।

—হবে না কেন! সমঝদার শ্রোতা মানে তো তোমাদের দুই ভাইবোনের মতো ফাজিল-কেষ্টর দল?...হুঃ, গান আর শুনলি কই যে বুঝবি সত্যিকার গান কাকে বলে!...হ্যাঁ, গান গাইতো বটে আমাদের মেঘনাদ রায়। সে কী ব্যাপার! যেমন ভরাটি ভয়েস, তেমনি গিটকিরি!...গলার কাজই বা কি! গলার ভেতর সাতটা সুর

নিয়ে খেলাচ্ছে—যেন সাতটা পাখী। সেই সাত-সাতটা পাখীকে দিলে ইচ্ছে মতন উড়িয়ে—তারপর আবার হরেক রকম কসরৎ ক'রে সেই সুরকে গলার ভেতর ফিরিয়ে আনা। চারটিখানি কথা?

—বাবারে! সেজমামা, তোমার কথা শুনে গা শির্ শির্ করছে আমার। ছোড়দি প্রায় শিউড়ে উঠে বলে—তোমার কথা শুনে মনে হ'লো কে যেন সাত-সাতটা পাখী ধ'রে-ধ'রে গিলছে। উঃ! গান, না, যাদুবিদ্যে? পি. সি. সরকার তো আস্ত একটা হাঁস গিলতে পারে তাহ'লে—তাকেও একজন বড়ো গাইয়ে বলতে হয়!

—যা যা, ফাজলেমি করিসনে! হুঁঃ, কি বলবো—শোনাতে তো পারলাম না, নইলে দেখিয়ে দিতাম। মেঘনাদ রায় বেঁচে থাকলে—তোদের এই সব বসন্ত মুখুয্যে আর সরোজ মল্লিক, গগনময় মিত্তির আর পাঁচু দত্ত, সমাজে কল্কে পেতো?

—বা রে সেজমামা, বেশ, বেশ!...মার শাসন ভুলে হেসে উঠি...তুমি যে দেখছি জ্যান্ত মাছ পোকা পড়াতে পার! জলজ্যান্ত লোকটিকে মরিয়েই দিলে? মেঘনাদ রায়ের গান না শুনি, নাম তো শুনেছি। তিনি যে এখন গানটান ছেড়ে দিয়ে আলমোড়ায় না কোথায় একটা কী যেন আশ্রমে রয়েছেন!

—তাই নাকি?—সেজমামা জলজ্যান্ত লোকটাকে মরিয়ে দেবার অপরাধে কিছু-মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেন—তা, ও একরকম মৃত্যুই। আর্টিষ্ট যদি তার আর্টের চর্চ্চা ছেড়ে দিলো, তার আর রইলো কি? মরে গেছেই ধ'রে নিতে হবে।

—ধ'রে অবশ্য নিতে পারি আমরা—দার্শনিকের ভঙ্গীতে ছোড়দি বলে—কিন্তু সে ভদ্রলোক জানতে পারলে খুশী হবেন কি না, সেই এক ভাবনা।

—কিন্তু সেজমামা, তিনি চর্চ্চা যে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন তাও তো নয়—মেঘনাদ রায়ের গান না শুনলেও নাম আমি শুনেছি, ও-বারের মিউজিক কনফারেন্সে নাম ছিল।

—থাকবেই তো! থাকবে না মানে? থাকতে বাধ্য। মেঘনাদ রায় না এলে মিউজিক কনফারেন্সের কোনো অর্থ হয়?...ওঃ, ছেলেবেলায় মেঘনাদ রায়ের গান শোনবার জন্যে সে কি কান্ড! একবার লিলুয়া থেকে হেঁটে এসেছিলাম ভবানীপুরে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

—বলো কি গো সেজমামা! পায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

—হুঁ! পা? পায়ের মতন তুচ্ছ জিনিসের কথা তখন কে মনে রাখে? হ্যাঁ অবিশ্যি, কন্‌কন্‌-ঝন্‌ঝন্‌ কট্‌কট্‌-ছট্‌ফট্‌ হচ্ছিলো সবই পায়ের মধ্যে, কিন্তু সব বিস্মরণ হয়ে গেলাম যখন মেঘনাদ রায় প্রথমেই তারা'য় তান ধ'রে সুরু ক'রে দিলো —"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী— হুঁ! বলে কি না গান ভালোবাসি না!

শুনে-শুনে কিন্তু সত্যিই কেমন একটু আফসোস হয়, আহা এমন গান শুনতে পেলাম না আমরা? কি জানি, সত্যিই হয়তো সে-সব হাই ক্লাশের গান শুনলে আর এই সব বাজে গায়কের সস্তা-সুরের গানগুলো গিলতেই পারবো না। আলুনি-আলুভাতের মতন লাগবে এদের 'আধুনিক' আর 'রাবীন্দ্রিক' গানগুলো।

কিন্তু মেঘনাদ রায় কি আর আলমোড়া থেকে ফিরবেন?

ইচ্ছাশক্তির শক্তির ওপর বিশেষ আস্থা কোনোদিনই ছিল না আমার, কিন্তু এবার যেন হ'চ্ছে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না আপনারা—মেঘনাদ রায় কলকাতায় এলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই এলেন। ভাবছেন, আষাঢ়ে গল্পের মতো যা ইচ্ছে বানাচ্ছি? মোটেই না। বিশ্বাস না হয়, বারোই সেপ্টেম্বরের কাগজ খুলে দেখুন, 'মহাবোধি সোসাইটি হলে' মেঘনাদ রায়ের লেক্‌চার আছে কি না—'গীতায় বেদান্ত দর্শন' সম্বন্ধে। আজকাল ওই সব চর্চ্চাতেই মেতে থাকেন কি না।

যাই হোক, তবু গুণী লোক বোধহয় পুরানো ভক্তদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে একদিন বেতার-কেন্দ্রে এসে—মাইক্রোফোনের সামনে বসে দুটো গান গেয়ে যেতে রাজী হয়েছেন। সেজমামা থাকতে-থাকতেই সুরের এই সুরাহা।

'আগামী কল্যের অনুষ্ঠান' ঘোষণা করতে-করতে যেই মেঘনাদ রায়ের নাম করেছে, আমি আর ছোড়দি প্রায় লাফাই আর কি! আমি লাফাতে যাচ্ছিলাম—সত্যিকথা বলতে কি, সেজমামার কথা যাচাই হবার আশায়, দেখি একবার কতো বড়ো গাইয়ে। ছোড়দি কেন লাফাতে গেল, সেই জানে।

লাফালাম না বটে—ছুটে গেলাম সেজমামার কাছে।

—সেজমামা, মেঘনাদ রায়!

সেজমামা বই থেকে মুখ তুলে গম্ভীরভাবে বলেন—আমাকে কিছু বলছো?

শোনো শোনো গল্প শোনো

—কালকে সেজমামা রেডিওতে—তোমার মেঘনাদ রায়ের নাম আছে।

—আমার মেঘনাদ।—সেজমামা নিজের অভ্যাস মতো চশমাটা বার-দুই খোলা-পরা ক'রে গম্ভীরভাবে বলেন—কথাটা বলা তোমার ভালো হয়নি বুলু, 'আমার মেঘনাদ' মানে? শিল্পী—সর্ব্বযুগের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের এবং সমগ্র মানুষের তা জানো?

অপ্রতিভ হয়ে বলি—আমি ইয়ে ক'রে বলছিলাম। মানে—তোমাদের আগেকার আমলের তো?

—আচ্ছা! সেজমামা এইবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন—কখন হ'চ্ছে?

—রাত্তির দশটায়।

—বেশ, বেশ। দেখিস তাহ'লে—গান কাকে বলে।

—দেখবো, না, শুনবো?

—ওই হ'লো। তোরা যা ফাজিল হয়েছিস!

পরদিন রাত্তির ন'টা বাজতে না বাজতেই সেজমামা ডাক-হাঁক জুড়ে দেন—ওরে কম্‌লি (অর্থাৎ, মা) চট্‌পট্‌ খাওয়া-দাওয়া সেরে নে, আজ দশটায় মেঘনাদ রায়ের গান আছে।

মা অবাক হয়ে বলেন—কেন সেজদা, তার জন্যে খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে কেন?

—হবে না? নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে-ব'সে শুনতে হবে না সকলে?...আর দেখ্‌, তোর ওই ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখিয়ে দেবো, সত্যিকার গাইয়ে কাকে বলে!... আজকালকার—ওই 'আধুনিক' না কি ঘোড়ার ডিমের গান শুনে-শুনে গোল্লায় যেতে বসেছে!...বল্‌ দিকি আমাদের আমলের সেই সব গান! হুঁঃ, সেকেলে ওস্তাদদের সাধনাই আলাদা।

মা হেসে ফেলে বলেন—কি জানি সেজদা, আমি চিরদিনই সুরে আনাড়ি।... ঠাকুর, মামাবাবুকে আর দিদিমণি-দাদাবাবুদের খেতে দাও!

অন্য দিনের চেয়ে একঘণ্টা আগে খেয়ে নিয়ে, অবহিত হয়ে বসি রেডিওকে ঘিরে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

ছোড়দি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে—দেখ বুলু, আমরা যেন সত্যনারায়ণের কথা শুনতে বসেছি।

—এই, চুপ্—চিম্‌টি কাটি ছোড়দিকে।

নাঃ, ইংরিজিতে খবর বলা আর শেষ হয় না! কখন যে দশটা বাজবে!...খবর বলা হ'লে সুরু হ'লো, 'অনুরোধের আসর'।

—থামা বাবা, থামা। সেজ মামা আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—দে, দে ওটার কান মলে চুপ করিয়ে। উঃ, অনুরোধের আসর তো নয়, যম-যন্ত্রণা! আচ্ছা, ততক্ষণ জুৎ ক'রে গোটা-দুই সিগারেট খেয়ে নিই। ঠিক সময় খুলবি ঘড়ি দেখে।

ব' সে-ব' সে একটির পর একটি সিগারেট ধ্বংস করেন সেজমামা জুৎ করে।

—হবে না? নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে-ব'সে শুনতে হবে না সকলে? [পৃঃ—৩০

হায়—হায়! ঘড়িটা যে দেড় মিনিট শ্লো ছিল তা কে জানে? প্রথম লাইনটাই

শোনো শোনো গল্প শোনো

মিস্! রেডিওর চাবি খুলেই দেখি—সুরু হয়ে গেছে গান! কিন্তু, একি? কি-রকম হ'লো? শুনেই আমি ছোড়দির দিকে তাকিয়ে যা ব'লে উঠতে যাই, সেটা ছোড়দি চিমটি কেটে থামিয়ে দিয়ে সেজমামার দিকে আঙুল দেখায়। আঙুল দেখাবার কি আছে তাই বলছেন?...সেজমামাকে দেখলে আর বলতেন না।...সে একেবারে ভাব-সমাধি! অর্দ্ধ নিমীলিত চোখ—ঘাড়টি ঈষৎ কাত—চেয়ারের হাতলে মৃদু-মৃদু আঙুলের টোকা।...

—কম্‌লি, শুনছিস্...

—এতক্ষণ শুনলাম সেজদা, এবার যাই, নীচে কাজ প'ড়ে রয়েছে।

—আরে, ধেত্তারি তোর নিকুচি করেছে কাজের, ভালো গান আর স্বয়ং ভগবান এক তা জানিস?...মনীষা শুনছিস?...বুলু?

—শুনছি বৈকি সেজমামা।

—আহা হা! হঠাৎ সেজমামা প্রবল শব্দে 'আহা-হা' ক'রে ওঠেন—ফার্ষ্টক্লাশ! ফাইন!! এক্সলেণ্ট!!! তানের গমকটা শুনলি একবার!

—হুঁ!

ক্রমাগত চিমটি কাটছে ছোড়দি আমায়।

—তোদের কি যেন ও ভদ্রলোকের নাম? সরোজ মল্লিক? গান গায়, না, ছড়া কাটে বোঝা দায়। আর, এ সব গাইয়ের গলায় কী মীড়ের মূর্চ্ছনা!...কী বিশুদ্ধ তান-লয়-মান! আহা-হা-হা!

সেজমামার প্রবল হুঙ্কারে মাঝে-মাঝে মেঘনাদ রায়ের গলাও চাপা প'ড়ে যাচ্ছে...তবু বারে-বারে শুনতে পাচ্ছি একটি লাইন—

—"রুণ্ রুণ্ ঝুন্ ঝুন্ নূপুর বাজে...
বাজে আমার চিত্ত মাঝে...
রুণ্ রুণ্ ঝুন্ ঝুন্ নূপুর বাজে—
রুণ্ রুণ্ ঝুন্ ঝুন্—"

সেজমামা বারে-বারে সগর্ব্বে তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। অর্থাৎ, শোন একবার। এমন নইলে গাইয়ে? একি তোদের ওই 'গড়িয়ে-পড়া' সরোজ মল্লিক?

তাঁর সুডোল সুগোল নাসিকাটির সঙ্গে.....

শোনো শোনো গল্প শোনো

—মনীষা, আর কোনোদিন করবি তর্ক?

—না সেজমামা, তাই কখনো করি? পাগল।

—বলু, তুই?

—ক্ষেপেছো মামা?

—আ হা-হা—এই যে—'রুণ্ রুণ্ ঝুন্ ঝুন্ নূপুর বাজে' সামান্য একটি লাইন, কিন্তু এইটুকুর মধ্যে সুরের কি ওঠা-পড়া লক্ষ্য করেছিস?...শুনতে - শুনতে মনে হয় নাগর-দোলায় চড়েছি।

মামা আর একবার 'শিবনেত্র' হয়ে বোধকরি নাগর-দোলায় চড়ার অপূর্ব্ব সুখটা অনুভব ক'রে নেন... কয়েক সেকেণ্ড...তার পরই হঠাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে শোনা যায় মামার—ইস্! মার্ভে-লাস!!

—মামা, বাংলায় বলো। আজকাল বাংলাটাই চলছে।

—আরে, ধেত্তারি নিকুচি করেছে তোর বাংলার। বাংলায় আবার ভাব প্রকাশ!

—ইস্! মার্ভেলাস!!

● সমঝদার

শোনো শোনো গল্প শোনো

ইংরিজি আর বাংলাতে তফাৎটা কি-রকম জানিস্? যেমন, গরম সিঙাড়া আর বাসি জিলিপি।

ছোড়দি বোধহয় আবার কিছু তুলতে যাচ্ছিলো, ইত্যবসরে—'রুণ্ রুণ্ ঝুন্ ঝুন্' বিলীন হয়ে এসেছে—আর ঘোষক মহাশয়ের ঘোষণা বিঘোষিত হ'চ্ছেঃ "নির্দ্দিষ্ট শিল্পীর অনুপস্থিতিতে এতক্ষণ আমাদের নিজস্ব ষ্টুডিওতে গৃহীত রেকর্ডে, সরোজকুমার মল্লিকের একখানি রাগপ্রধান বাংলা গান শোনানো হ'লো।... অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও, কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন!...এখন খেয়াল শোনাচ্ছেন—"

—রাবিশ্! ব'লে যতটা সম্ভব জোরে 'কড়াৎ' ক'রে রেডিওটার কান মলে দিয়ে, গট্‌গট্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান সেজমামা—আমাদের দিকে না তাকিয়েই।

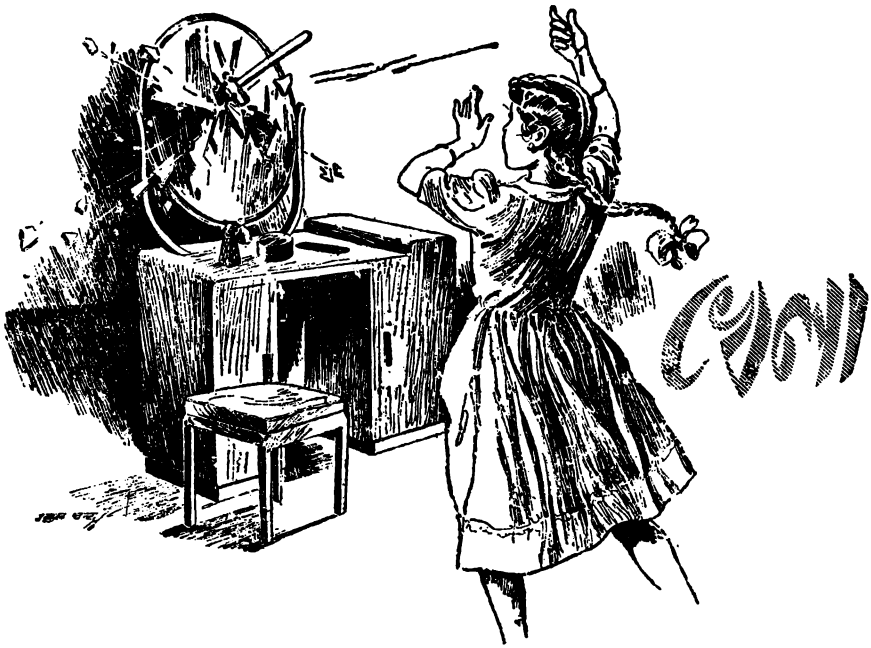

ঝন ঝন ঝনাৎ!

কাঁচের আর্ত্তনাদে সারা বাড়ীটাই ঝনঝনিয়ে উঠলো। উঠবেই তো,—সোজা তো নয়, যাকে বলে মরণ চীৎকার। গেছে, গেছে, নির্ঘাৎ খতম হয়ে গেছে—বড়ো একটা কাঁচের জিনিস। পুরনো আমলের দেয়াল ঘড়িটা, কি ড্রেসিং টেবলের গোল আয়নাটা, নয়তো বা আলমারির মাথায় রাখা ফুলদানীটা। নইলে এতো মোক্ষম শব্দ!

আর কারো নয় 'বুকু'র কীর্ত্তি!

ওর জ্বালায় বাড়ীতে কাঁচ আর রইলো না! মানছি কাঁচ জিনিসটা ভঙ্গুর, কিন্তু এক হিসেবে ওকে অক্ষয়-অব্যয়ও বলা চলে না কি? ক্ষয়ে, ঘুণ ধরে, বা লোনা লেগে কি মরচে পড়ে, আপনি আপনি ওর পরমায়ু ফুরোয় না।

কে জানে কাঁচ বেচারাদের চিরদাসত্ব দেখে দয়া করে তাদের দেহমুক্তির ভার নিয়েছে কিনা বুকু। বাড়ীতে যতো জানলার পাল্লা আছে তাদের শার্সির বদলে শুধুই ফোকর। ছবির ধারে-পাশে শুধুই কাঠের ফ্রেম। বইয়ের আলমারির

অবস্থাও তথৈবচ। বাড়ীতে এমন একটা পেয়ালা নেই যার হাতল আছে, কি পিরিচ আছে সেট্ মিলোনো।

অবিশ্যি শুধু কাঁচ ভাঙাই যে বুকুর পেশা, তা' নয়—তা' বলে! ইঁট-কাঠ লোহা-লক্কড় সবই সে ভাঙতে পারে, ভাঙেও। কাঁচগুলো যাবার বেলায় জানিয়ে দিয়ে যায় এই যা।

বুকুর মা মেয়েকে বলেন—'শনি দেবতা'!

খুব ভুল বলেন না।

ক'দিন আগে বুকুর মেজমাসী এসেছেন ত্রিবেণী থেকে, তিনি তো বুকুর কাণ্ড-কারখানা দেখে মিনিটে মিনিটে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। মেয়ে যে এতো বড়ো 'দস্যি' হ'তে পারে, এ নাকি তিনি একশো জন্মেও দেখেননি।

অবিশ্যি বুকুর মেজমাসী জাতিস্মর কি না, আগের একশো জন্মের কথা তাঁর মনে আছে কি না, এ নিয়ে কেউ তর্ক তোলেনি। কাজেই তিনি যখন তখন ভবিষ্যৎ-বাণীও করছেন—দেখ্ শানু, যদি ভালো চাস্ তো এখনো মেয়ে শায়েস্তা কর, নইলে—এ মেয়ে নিয়ে তোর অদৃষ্টে ঢের দুঃখু আছে।

বুকুর মা বেচারা বুকুর গুরুজন হলেও ছেলেমানুষ বৈ তো নয়, দিদির ধমকে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন—কি করে শায়েস্তা করবো দিদি, ওর যে কোনো বুদ্ধি নেই!

মেজমাসী ধম্‌কে ওঠেন—না বুদ্ধি নেই! পাকা পাকা কথার বেলাতে তো খুব বুদ্ধি আছে?

এদিকে আবার ব্যাপার হয়েছে কি, মাসী এসে পর্য্যন্ত বুকু মোটেই মায়ের নাগাল পাচ্ছে না। বাবা তো উদয়াস্ত কাজে ব্যস্ত, কাজে কাজেই নিঃসঙ্গ বুকু আরো মারাত্মক হয়ে উঠেছে। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' হয়েই থাকে, জানা কথা!

আজকের ব্যাপারটা এই—বিকেলবেলা বুকুর মা মহোৎসাহে তাঁর মেজদির কাছে "করমচার কাটলেট্" বানাতে শিখছেন, তখন স্কুল থেকে এসে মায়ের কাছে দাঁড়ালো বুকু মুখটি ম্লান করে।

অন্যদিন রাস্তা থেকে মাকে ডাকতে ডাকতে আর ধুপ্‌ধাপ্ করতে করতে

শোনো শোনো গল্প শোনো

আসে, আজ কেন এমন চুপচাপ, এ আর মা-মাসীর খেয়াল হলো না। মা ব্যস্তভাবে বললেন—বুকু, চট করে মুখ-হাত ধুয়ে এসো, আজ একটা নতুন খাবার খেতে দেবো।

নতুন খাবারের প্রলোভনে চঞ্চল হবে বুকু এমন মেয়ে নয়, তা' ছাড়া—মাসী এসে পর্য্যন্ত অনেক কিম্ভূত-কিমাকার নতুন খাবার সে খাচ্ছে। অতএব মুখ ধুতে না গিয়ে মার পিঠের কাছে বসে পড়ে বললো—মা, টাইফয়েড্ কি?

বুকুর মা উত্তর দেবার আগে তার মেজমাসী খরখর করে বলে উঠলেন—ওমা শোনো কথা! একফোঁটা মেয়ে তোর ওসব রোগ-বালাইয়ের ব্যাখ্যানায় দরকার কি রে?

—তোমাকে তো বলিনি—বলে বুকু মার পিঠের উপর মুখ রেখে বলে—বলোনা মা!

—কি মুস্কিল! বুকুর মা বলেন—সত্যিই তো—কি দরকার তোর ও কথায়? কে বলেছে তোকে?

—জানি না, তুমি বলো—

—ও একটা শক্ত অসুখ! ছোটো ছেলেদের ওর নাম করতে নেই!

বুকু মুখ তুলে সতেজে বলে—বেশ আছো! ছোটোদের ওর নাম বলতে নেই, আর ছোটোদের হ'তে আছে কেমন? আমার যদি টাইফয়েড্ হয়, আমি মরে যাবো?

এবার মেজমাসী একটি বড়ো ধমক না দিয়ে পারেন না,—আ গেলো যা! কী বেয়াড়া মেয়ে গো! বারণ করলে কথা শোনে না! হ'তো যদি আমাদের বাড়ী! হুঃ! টের পেতো মজা!...আর তোকেও বলি শানু, মেয়ে অবাধ্য হবে না কেন? শাসন কা'কে বলে জেনেছে কখনো? এই যদি তুই না হয়ে আমার ছোটো জা হ'তো, মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিতো।

বুকুর মা হতাশভাবে বলেন—মারতে আমি পারি না মেজদি।

—মারতে পারো না? না মারলে ছেলে 'মানুষ' হয়? তাই জন্যেই অতো শয়তান হয়ে উঠেছে তোর মেয়ে।

বুকুর মা নিজেই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন—ওর কি কোনো জ্ঞান-গম্যি আছে মেজদি? পাগল বৈতো নয়?

—চমৎকার! তাহ'লে তো আরো ভালো। শয়তান নয়, পাগল! পাগল যদি তো তার চিকিৎসা করা। পাগল! হুঁঃ! পাগল করতে পারে মানুষকে!

আ গেলো যা! কী বেয়াড়া মেয়ে গো! [পৃষ্ঠা—৩৭

বুকু মার 'পিঠস্থান' ছেড়ে, 'রোষকষায়িত' না কি বলে, সেই রকম দৃষ্টিতে একবার মাসীর দিকে তাকিয়ে গটগট করে চলে যায়।

ও দেখছে মাসী যেন তাকে জ্বালাতন করবার জন্যেই এসেছে। কেন? চলে যাকনা ও ওর নিজের বাড়ী!

বুকুর মা মেজদির ভয়ে আস্তে আস্তে বলেন—ও বুকু, মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে যাস।

বুকু সে কথায় কান দেয় না।

মেজমাসী বোধহয় সেই রোষকষায়িত দৃষ্টির দহনজ্বালায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—থাক্ অতো খোসামোদ করতে হবে না! খিদে পেলে আপনি এসে খেতে পথ পাবে না!

শোনো শোনো গল্প শোনো

তাঁদের ত্রিবেণীর বিরাট গুষ্টির বাড়ীতে, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েই বিশ-বাইশটি, সেখানে তিনি এইরকমই দেখে আসছেন।

ছোটরা যে আবার মানুষ, তাদের যে মনপ্রাণ আছে, মান অপমান বোধ আছে, একথা মেজমাসীরা জানেন না। বড়োদের 'ইচ্ছের পুতুল' হবার জন্যেই ছোটদের এই পৃথিবীতে আসা, এই তাঁদের ধারণা।

ছোট ছেলেমেয়েদেরও যে সমীহ করতে হয়, সম্মান করতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, একথা শুনলে মেজমাসীর দল হেসেই অস্থির হবেন।...তাদের জন্যে আবার এতো খরচ করবারই বা মানে কি! আট বছরের মেয়ের আটজোড়া জুতো! সেদিন দোকানে গিয়ে বিনা দরকারে মেয়ে আবদার করলো--'বাবা, আমি ওই লাল জামাটা পরবো'—অমনি কিনে দিলো তার বাবা! শুনেছে কেউ এমন কথা? ওইটুকু মেয়ের স্কুলের খরচা নাকি ছত্রিশ টাকা!

মেয়ে তো পাগল নয়, পাগল তার মা-বাপ!

বুকু উঠে যাবার পর, করমচাগুলিকে কাট্‌লেটে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে এইসব মন্তব্য করতে থাকেন মেজমাসী।...কি করবেন, পরের মেয়ে তাই, নইলে তিনি এ ক'দিনেই মেয়েকে ঢীট্ করে ছাড়তেন। খেতে না দিলেই ছেলেপুলে জব্দ। দেখ্ চেয়ে খায় কিনা!

বুকুর মা বললেন—ও খাবে চেয়ে নিয়ে! তাহ'লেই হয়েছে!

—আচ্ছা দেখ্ একদিন! খবরদার ডাকিসনে।

অগত্যাই ডাকতে সাহস করেন নি বুকুর মা। মেজমাসীও বুকুর কথা ভুলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

খানিক পরেই এই আর্ত্তনাদ!

না, না, বুকুর নয়, সেই যে আগে বলেছি কাঁচের!

ড্রেসিং টেবিলের সেই গোল আয়নাটিই খতম! আহা! বুকুর মার যেটি প্রাণ-তুল্য! প্রাণতুল্য বলেই বোধহয় এতোদিন অনেক সাবধানে বুকুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এসেছিলেন, শেষরক্ষা হলো না।

ঝন্ ঝন্ শব্দে চমক খেয়ে সকলেই অকুস্থলে এসে হাজির। বুকুর বাবা সেই-

মাত্র কোর্ট থেকে ফিরেছেন, তিনিও এসে দেখেন—আহা! চোখে জল আসার মতোই দৃশ্য। অমন সুন্দর টেবলটা তার মাঝখান আলো করা ষোলোকলা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল আয়নাটির মাত্র এককলা ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে আটকে আছে, বাকী পনেরোকলা পনেরো টুকরো হয়ে ছত্রখান। আশ্চর্য্য! এমনভাবে ভাঙলো কি করে ওইটুকু মেয়ে!

পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে বুকু, পাথরের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে সকলেই।

মুখ দিয়ে কথা সরছে না যেন কারো।...

একটু পরে ছোঁড়া চাকর দীনেশটা যেই হেঁট হয়ে কাঁচ কুড়োতে চেষ্টা করেছে, তখন যেন চৈতন্য ফিরে পেয়ে মেজমাসী ধিক্কার দিয়ে ওঠেন—চমৎকার! এই তো চাই! এমন নইলে মেয়ে! কী সর্ব্বনেশে দস্যি মেয়ে গো; দেখে-শুনে 'থ' বনে যাচ্ছি যে!...তবু তোরা মুখটি বুজে আছিস? একটু শাসন করছিস না?... তোমাকেও বলি অরবিন্দ, তুমি কি পাগল? মেয়েকে পরের ঘরে দিতে হবে একথা একবার ভাবোনা? এমন চণ্ডালে রাগ মেয়ের যে, এমনি করে সংসারের জিনিস ধ্বংস করে? এর শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে না মাসে মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ করে যাচ্ছো তুমি? এর নাম শিক্ষা? হ্যাঁ, শিক্ষা বলবো বটে আমাদের বাড়ীর। বড়োদের রাগেই ছেলে-পুলে থরহরিকম্প! তাদের আবার রাগ ঝাল!

এতোক্ষণে বুকুর বাবার মুখে কথা ফোটে—রাগ? রাগ কিসের?

—ওই যে তখন বকা হয়েছে মহারাণীকে। সেই রাগে—

হঠাৎ বুকু চীৎকার করে ওঠে—ইস্! রাগ করে বৈকি, ও তো বোমা লেগে ভেঙে গেছে!

বোমা!

ঘরসুদ্ধু সকলের উপরই যেন বোমা পড়লো।

—বোমা মানে?

—বোমা মানে আবার কি—বুকু অবহেলা ভরে বলে—বোমা মানে বড়ো হাতুড়ীটা! খেলাঘরের যুদ্ধুতে হাতুড়ীকেই বোমা বলে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

—যুদ্ধ! যুদ্ধ কার সঙ্গে রে?...অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন অরবিন্দবাবু—আর্শির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলি নাকি তুই?

—আহা! আর্শির সঙ্গে বৈ কি! যেমন না বুদ্ধি তোমার—বুকু বাবার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, চঞ্চল দুটি চোখকে স্থির করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আর্শির সঙ্গে আবার যুদ্ধ করে নাকি—মানুষে? আমি তো—আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলাম!

—তোর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলি তুই?...অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন বুকুর মা।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ!...পাকা মেয়ের মতো উত্তর দেয় বুকু—আর্শির মধ্যে যে 'আমি'টা থাকে, সেইটাই হলো শত্রুপক্ষ! ওর সঙ্গেই কষে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছিলাম!...ও আমাকে বোমা ছুঁড়লো, আমি ওকে বোমা ছুঁড়লাম—হি হি হি ও একেবারে অক্কা, আর আমার কিচ্ছু হলো না। খুব মজা নয় বাবা?

শুনে অরবিন্দবাবু হাসবেন, না কাঁদবেন? তবু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললেন—কিন্তু অমন সুন্দর আর্শিটা ভাঙা তো আর মজা নয়। তোমার মা এখন কি দিয়ে চুল বাঁধবেন?

বাবার গম্ভীর মুখ!

আর কোথায় আছে বুকু। চোখ ছলছল করে হেঁট মুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

মেজমাসী গালে হাত দিয়ে বলেন—ধন্যি বটে অরবিন্দ, এই শাসন হলো মেয়ের? যে জায়গায় মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবার কথা, সেখানে এই? তাও মেয়ের চোখে জল এসে যাচ্ছে। কি জানি ভাই, বিলেত থেকে ছেলে মানুষ করতে শিখে এসেছো না কি তোমরা?

বুকুর মা কিন্তু বুঝেছেন বুকুকে এতেই যথেষ্ট শাসন করা হয়েছে। মেয়ের কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে মায়া হয় তাঁর, তাড়াতাড়ি তার মন ভালো করতে বললেন—আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই, বুকু! নিজের সঙ্গে আবার কেউ যুদ্ধ করে নাকি?

ব্যস! ঝরতে যেটুকু বাকী ছিলো, সেটুকু আর বাকী থাকে না! বুকু কেঁদে ফেলে বলে—কার সঙ্গে যুদ্ধ করবো তবে? ইস্কুলে তো রুবির সঙ্গেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করতাম, দিদিমণি বললেন—'পুজোর ছুটির সময় রুবি টাইফয়েডে মারা গেছে।'

মারা যাওয়া মানেই তো মরে যাওয়া! মরে গেলে আর কক্‌খনো আসে না, জানি আমি!

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বুকুর মা, এতোক্ষণে সব রহস্য ভেদ হয়ে যায় তাঁর কাছে; বুকুর বাবা আন্দাজেই সব বুঝে নেন। ঝি চাকররা সরে যায়, আর মেজমাসী অস্ফুট স্বরে বলতে বলতে চলে যান—তুমি আবার কি না জানো! তোমার বাপকে তুমি একহাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারো!...তাঁর ধারণা, আটবছরের বুকুর এ সমস্তই ঢং!

ধন্যি বটে অরবিন্দ, এই শাসন হলো মেয়ের? [পৃঃ ৪১

কিন্তু শুধু ধারণা নিয়েই তো থাকবেন না মেজমাসী, বুকুকে তিনি সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করে ছাড়বেনই!

তাই যাবার সময় বোনকে ধরে বসলেন—তোর মেয়েকে আমার সঙ্গে দে, আমাদের সুশিক্ষার বাড়ীতে, পাঁচটা ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মানুষ হয়ে একটু জ্ঞান জন্মাক!

বুকুর মা ভয়ে ভয়ে বলেন—আমাকে ছেড়ে কি ও থাকতে পারবে মেজদি?

—পারবে না আবার কি? পারালেই পারে। যতো 'আহা' 'আহা' করবি, ছেলেপুলে ততো পেয়ে বসবে!

ভয়ে আর উত্তর দেন না বুকুর মা। কিন্তু বুকুর বাবা উল্টো কথা বলেন। তিনি বলেন—ওরে বাবা, বুকুকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি?

অতএব বুকুর আর ত্রিবেণীতে মাসীর বাড়ী যাওয়া হলো না। তার বদলে, মেজমাসীরই দুই মেয়ে ত্রিবেণী থেকে চলে এলো কলকাতায় মাসীর বাড়ী।

ওদের দৃষ্টান্তে বুকুর কিছু উন্নতি হবে, এই হচ্ছে মেজমাসীর ধারণা। মেজ-মাসীর মেয়েদের নাকি সাত চড়ে 'রা' বেরোয় না, গলার আওয়াজ শুনতে পায় না কেউ।...নিঃশব্দে খেলা করে ওরা, খেলনাপাতি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে।

হাঁড়িকুঁড়ির বিরাট বোঝা নিয়ে ওরা এলো।

ইস্কুল টিস্কুলের বালাই নেই ওদের, যতোদিন খুসি মাসীর বাড়ী থাকতে পারবে। মেজমাসী চলে গেলেন অবশ্য।

কাটে কিছুদিন।

বুকুর মা বলেন—যাই বলো বাপু, মেজদি আমাদের খুব হিতৈষী। বুকুর সুশিক্ষার জন্যে ভাবনার অন্ত নেই ওঁর।

অরবিন্দবাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—সব জিনিসেই আবার অনন্ত হওয়া ভালো নয়, অন্ত থাকাই ছিলো ভালো।

—তোমার ওই এক কথা।...লক্ষ্য করেছো তুমি অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে বুকু! দিন রাত সেই হুটোপাটি ছুটোছুটি তচ্‌নচ্‌ কাণ্ড নেই। তিনটি বোনে কোণে বসে ঘরকন্না খেলা খেলছে। লক্ষ্য করোনি?

—করেছি বৈ কি? গম্ভীর ভাবে বলেন অরবিন্দবাবু।

—মেজদি যে অহঙ্কার করে বলেন ওঁদের বাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষা ভালো, সে কথা মিথ্যে নয়। কী সুন্দর শান্তশিষ্ট মেয়েরা! এই যে টেঁপু খুদু আজ মাসখানেক হতে চললো আছে, একটু দৌরাত্ম্য দেখেছো?

—না! তবে ভাবছি, ওরা আর কতোদিন থাকবে? যতোই হোক পরের বাড়ী।

বুকুর মা ফোঁস্‌ করে ওঠেন—ছি ছি এই তোমার মনের ভাব? মেজদির মেয়েরা আমার বাড়ী থাকলে পরের বাড়ী থাকা হয়? বেশ কালই আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আহা, আমি কি তাই বলছি!

চুপ করে যান ভদ্রলোক। কিন্তু ভারী মন খারাপ হয়ে থাকে তাঁর। কি জানি কেন বুকুর সেই সর্ব্বদা মাথায় পাগড়ী বাঁধা লাঠিসোঁটা হাতে রণরঙ্গিণী অবস্থাই তাঁর ভালো লাগে। মায়ের একখানা শাড়ী জড়িয়ে বৌ সেজে খেলা করছে বুকু এই দেখলেই রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় তাঁর।

হঠাৎ একদিন খেলাঘরে ঝড় উঠলো। শান্তশিষ্ট টেঁপু খুদুর গলাবাজিতে বাড়ী বেশ সরগরম হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে বুকুর গলাও দিব্যি শোনা যাচ্ছে।

অরবিন্দবাবু কোর্ট থেকে এসে সবে বসেছেন, চমকে বললেন—কি হলো? ওরা অতো চেঁচামেচি করছে যে?

বুকুর মা জলখাবার গোছাতে গোছাতে অগ্রাহ্য ভরে বলেন—ও বোধহয় খেলা-ঘরের গোলমাল!

—খেলাঘরের গোলমাল! মানে কি? বুকু! বুকু! বুকু!

বাপের ডাক শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো বুকু। একমুখ ঘাম, পরণে একটা শাড়ী।

—ডাকছো বাবা?

—হ্যাঁ! তোমরা অতো চেঁচামেচি করছো কেন?

—আমরা ঝগড়া-ঝগড়া খেলছি বাবা।

—ঝগড়া-ঝগড়া খেলছো! তোমরা ঝগড়া-ঝগড়া খেলছো?

বুকু বাপের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাকা পাকা মুখে বলে—ঝগড়া না করলে কি আর সংসার করা যায় বাবা? সংসারটা যে মহা পাজী জায়গা!...একধার থেকে সবাই স্বার্থপর!...এই দেখোনা—টেঁপুদি তো আমার খেলাঘরের বড়ো জা হয়েছে! খুদুদি আমার ননদ! ওরা কী করেছে জানো, বড়ো বড়ো মাছগুলো নিজের ছেলেদের খাইয়ে দিয়েছে, আর ছোট দু'খানি রেখেছে আমার ছেলে দু'টোর জন্যে!...আমার ছেলেরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে বাবা?...পাঁচজনের সংসারে থেকে সকলের সঙ্গে কতো যুদ্ধ করে যে ছেলে দু'টোকে মানুষ করে তুলছি!

শোনো শোনো গল্প শোনো

বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে থাকেন অরবিন্দবাবু, সর্পাহতের মতো কাঠ হয়ে যান বুকুর মা!

একটু পরে অরবিন্দবাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—যাও এই বিশ্রী পোষাকটা খুলে ফেলে ভালো ফ্রক পরে এসো একটা, বেড়াতে নিয়ে যাবো।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমার বোনঝিদের জামাটামাগুলো গুছিয়ে রেখো, কাল ভোরের গাড়ীতে ত্রিবেণী রেখে আসবো ওদের।

বুকুর মা অবাক হয়ে বলেন—রেখে আসবে? হঠাৎ এরকম রেখে এলে নিন্দে হবে না?

অরবিন্দবাবু হঠাৎ হেসে উঠে বলেন—হবে বৈকি, নিশ্চয় হবে! সংসার জায়গাটা যে মহাপাজী! কিন্তু হলেই বা করা যাবে কি? শিখলে না এখ্খুনি নিজের মেয়ের কাছে, "পাঁচজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে ছেলে মানুষ করে তুলতে হয়!" নিজেদের খানিকটা নিন্দে হওয়া, আর মেয়েটার পরকাল ঝরঝরে হওয়া, এই দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা বেশী লোকসান মনে হয় তোমার? নিজের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে বুকু যদি ঘরবাড়ী ভাঙে, সেটা সইবে, কিন্তু পরের সঙ্গে ঝগড়ার খেলা খেলে সংসার ভাঙতে শিখলে সইবে না।

—ডাকছো বাবা? [পৃঃ ৪৪

অপরাধী

পরীক্ষার "ফী" জমা দেবার তারিখ সন্নিকট হয়ে আসছে, অথচ একটি টাকা জোগাড় হলো না আজ পর্য্যন্ত।

টাকার চেষ্টায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় সুকুমার, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। বাবা মারা যাবার পর থেকে আজ তিন চার বছর যাঁর সাহায্যে পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, সেই মামাটি যে ঠিক বি-এ পরীক্ষার আগেই হঠাৎ মারা গিয়ে, অকূলে ভাসিয়ে যাবেন সুকুমারকে—সে কথা কে ভেবেছিল?

মামা ছিলেন খরচে লোক—বরং কিছু ধার করে রেখে গেছেন তো জমা রেখে যাননি একটি ফুটো পয়সা। কাজেই মামীর কাছে গিয়ে হাত পাতাও অসম্ভব।

কোন্ মুখেই বা যাবে 'শোকাতাপা' মানুষটার কাছে হাত পাততে?

কূলে এসে তরী ডোবা একেই বলে!

মামার মৃত্যুর জন্যে যতোটা—তার চাইতে অনেকগুণ আঘাত পেলো সুকুমার তাঁর এই রকম অসময়ে যাওয়াতে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

সকাল বিকেল সন্ধ্যা অনবরত ঘুরে বেড়ায় সুকুমার, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী বাড়ী।...সাহায্য না হোক, ধারও যদি কেউ দেয়! বি-এ-টা পাস করলে—আর তা' সে করবেই সে বিশ্বাস আছে, তখন তো এমন দুরবস্থা থাকবে না! সবাইয়ের সব ধার শোধ করে দিতে পারবে। যেন বি-এ পাস করে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে টাকা ঝরবে!

ছাত্র-জীবনে সকলেই যেমন আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে, তেমনি দেখতে থাকে সুকুমার। পৃথিবীটা যে একটা দুঃস্বপ্ন সে আর খেয়াল হয় না।

আত্মীয়-স্বজন টাকার বদলে দেন মামুলি সদুপদেশ!

কেউ বলেন কতকগুলো ডিগ্রী নিয়ে কি লাভ? গ্র্যাজুয়েট হয়ে তো চারখানা হাত গজাবে না! দেশের বেকার সংখ্যা বাড়ানো, তার চেয়ে রিকশা টানা ভালো।

দেশসুদ্ধ ছেলে ডিগ্রীর আশা ছেড়ে রিকশা টানলে—রিকশায় চড়বে কে, তা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না সুকুমারের।

কেউ বা আরো দরাজভাবে বলেন—চাষ করো—তাঁত বোনো—দোকান খোলো—পাস করে কী কচুপোড়া হবে? অতএব পরীক্ষার "ফী" জমা দেওয়ার কথাই উঠতে পারে না।

কিন্তু সুকুমারের সমস্ত স্বপ্ন যে জমাট বেঁধে আছে ওই পরীক্ষার মধ্যে।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর যেন সাধনা হয়েছে—'পাস করবো, মানুষ হবো—'

তার ওপর মা?

টাকার অভাবে ছেলের এতো পরিশ্রম ব্যর্থ হতে দেখলে তিনি কি আর বাঁচবেন? এমনিতেই তো একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

শোনো শোনো গল্প শোনো

বহু জায়গায় ঘুরে আসে সুকুমার, আর মুখ শুকিয়ে বাড়ী ফেরে।

অন্নপূর্ণা দেবী হতাশদৃষ্টি মেলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান। কিন্তু ভগবান আজকাল এমনই বুড়ো হয়ে গেছেন যে, চোখেও দেখেন না, কানেও শোনেন না!

অবশেষে একদিন—

যখন আর কোথাও আশার আলো নেই, অথচ দিন এগিয়ে এসেছে—অন্নপূর্ণা ছেলেকে ডেকে যা বলেন, তা' শুধু মর্ম্মান্তিক নয়, ভয়ানকও।

অন্নপূর্ণার শাশুড়ীর আমল থেকে লক্ষ্মীর কৌটায় তোলা আছে একটি সিঁদুর-মাখানো গিনি—সেইখানি বার করে দেবেন ছেলেকে! ঘরে সোনা বলতে তো আর কিছুই নেই।

মার কথা শুনে সুকুমার কাতর হয়ে বলে—দরকার নেই মা আমার পরীক্ষায়, লক্ষ্মীর গিনি বেচতে পারবো না।

অন্নপূর্ণারও বুক কাঁপছিল, তবু মনে জোর করে বলেন—তা' হোক বাবা, তোমার হাত দিয়েই আবার মা লক্ষ্মী কতো পুজো নেবেন। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই রোজগারী হয়ে লক্ষ্মীর সোনার কৌটো গড়িয়ে দিবি!

আজকালকার দিনে আশীর্ব্বাদের কোনো দাম আছে কিনা, না জানলেও আশীর্ব্বাদ করেই থাকে মানুষে। অনেক তর্কবিতর্ক অনেক পরামর্শের পর নেওয়াই ঠিক হলো।

একদিকে একটা সংস্কার আর একদিকে সুকুমারের ভবিষ্যতের আশা! আশারই জয় হলো!

মনে মনে লক্ষ্মীঠাকরুণ আর স্বর্গতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে প্রণাম করে কৌটা খুললেন অন্নপূর্ণা।

গিনিটা নিয়ে সুকুমার যখন বেরোচ্ছে, অন্নপূর্ণা সাবধানের সুরে বলেন—দেখিস ভালো করে পথ দেখে হাঁটিস। আর নয় তো—মাধবকে সঙ্গে নে।

সুকুমারেরও একটু ভয়-ভয় করছিল। কোথায় স্যাকরার দোকান, কি করে

রাবিশ!.....গট্ গট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান সেজমামা.....

বেচতে হয়, কিছুই জানে না বেচারা! দোকানের একটা জিনিস কেনা, আর ঘরের একটা জিনিস বিক্রি করার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ!

অবিশ্যি মুখে বললে—আবার মাধবকে কেন? মাধব আমায় পাহারা দেবে না কি?

তবু এদিক-ওদিক চাইলো। কাছেই ছিল মাধব, অন্নপূর্ণা একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন তাকে সুকুমারের সঙ্গে।

মাধব ছেলেটির একটু ইতিহাস আছে।

লোকে বলে—'বানের জলে ভেসে আসা'—তা' মাধব সত্যিই 'বানের জলে ভেসে আসা' ছেলে।

ভাসতে ভাসতে কি ভাবে যে ও এ-সংসারের কূলে এসে ঠেকেছিল, সে বলতে গেলে অনেক কথা। মোট কথা এখানে এসে আশ্রয় পেলো সে। সুকুমারের বাবা তখন বেঁচে।

একটা দুঃখী ছেলেকে দুটি ভাত দেওয়া তখন এতো শক্ত ছিল না। তা ছাড়া ঠিক চাকর না বললেও চাকরের মতো কাজগুলো তো প্রায় সবই পাওয়া যায় একমাত্র বাসন মাজা বাদে।

এখন অবিশ্যি একটা মানুষের ভারও যথেষ্ট ভারী, কিন্তু সে আর মনে পড়ে না অন্নপূর্ণার। থাকতে থাকতে বাড়ীর ছেলের মতোই হয়ে গেছে মাধব।

ও যে আশ্রিত, ও যে অপ্রয়োজনীয়, ওকে যে খেতে দিতে হচ্ছে, মা ছেলে কেউই ভাবেন নি কোনো দিন। যেমন সুকুমার তেমনি মাধবও বাড়ীর একটা ছেলে।

মাধবও নিজের দাদার মতোই দেখে সুকুমারকে।

সুকুমারের পড়ার ক্ষতি হবে ভেবে সংসারের সব কিছুই ও করে। সুকুমারের পড়তে পড়তে পাছে ঘুম আসে বলে ও দরজায় বসে পাহারা দেয়। মশা তাড়ায়, বাতাস করে, কাঠ-কয়লা জেবলে দুপুর রাতে চা তৈরি করে দেয়।

অন্নপূর্ণা যখন তাকে যেতে বললেন—তখুনি ছুটলো পিছন পিছন।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এলো দু'জনে। বেচেছে বটে, অনেক ঘোরাঘুরি করে। তাও ন্যায্য দাম পাওয়া গেল কি না কে জানে।

চুয়াত্তর টাকা আট আনা অন্নপূর্ণার হাতে এনে দিলো সুকুমার অশ্রুসজল চক্ষে তুলে রাখলেন অন্নপূর্ণা।

আর তিনটি দিন পরেই বার করে দিতে হবে মা-লক্ষ্মীর শেষ চিহ্ন!

জমা দেবার আগের দিন রাত্রে শুতে যাবার আগে অন্নপূর্ণা হঠাৎ তীব্র আর্ত্তনাদ করে ডেকে উঠলেন—সুকু!

সুকুমার শুয়ে পড়েছিল, ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো—কি মা, কি? কিছু কামড়ালো না কি?

অন্নপূর্ণা কপালে করাঘাত করে বললেন—কামড়েছেই বটে বাবা! একেবারে মোক্ষম কামড়! কিন্তু এ বিষে তো মরবো না বাবা, খানিকটা বিষ এনে দে খাই!

পাগলের মতো কপাল ঠুকতে থাকেন অন্নপূর্ণা।

সুকুমার মাকে ধরে অস্থির হয়ে বলে, কি হলো তাই বলো।

—হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! টাকা নেই! হারিয়ে গেছে।

টাকা নেই!—হারিয়ে গেছে! এ আবার কোন্ ভাষা শুনছে সুকুমার? বাঙলা?...না অজানিত কোনো দেশের?

ভূমিকম্প হচ্ছে?

দুলে উঠেছে সমস্ত পৃথিবী?.....

ঘরে কি আলো জ্বলছে না? পৃথিবীতে কি কোনো দিন আলো ছিল?

মা'র কথারই পুনরাবৃত্তি করে সে বোকার মতো, বিমূঢ়ের মতো—

—টাকা নেই! হারিয়ে গেছে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এই দেখ, বাক্সের সমস্ত খুপরি। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও নেই, একটি আধলাও নয়!

—মা! কি বলছো তুমি?

—হ্যাঁ বাবা! এই বলছি! এইবার দে আমায় একটু বিষ এনে।

সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—বিষ আমারই খাওয়া উচিত। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—পরীক্ষা দিতে না পারলে আর মুখ দেখাবো না কাউকে। টাকা না থাকলে পরীক্ষা দেওয়া হবে না। অতএব—

আর অন্নপূর্ণার বলবার জো নেই—ভাবিসনে সুকু, ভগবান কি এতোই নির্দ্দয়? যা হয় একটা উপায় হবেই।

মনের সমস্ত ধৈর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে অন্নপূর্ণার। পাগলের মতো এলোমেলো কাণ্ড করছেন তিনি। লক্ষ্মীর টাকা!

সুকুর ভবিষ্যৎ!

সুকুমারের বুক ভেঙ্গে গেলেও মাকে প্রবোধ দিতে হলো তাকেই।—কে দেবে?

অনেক হা-হুতোশ অনেক পাগলামির পর একটু ধৈর্য্য ধরতেই হলো। কাল-বৈশাখীর পরও তো প্রকৃতি স্থির হয়। কিন্তু প্রশ্নটা তো রইলো তীক্ষ্ণ হয়ে।

—কোথায় গেল?

—হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! টাকা নেই! [পৃষ্ঠা—৫০

—কে নিলে?

ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে না টাকা, পারে না হেঁটে পালাতে। হাতে করে সরাতে হয়েছে কাউকে।

কে সে? কে আছে আর?

সুকুমার নয়—অন্নপূর্ণা নিজে নয়। তবে?

তবে? তবে? তবে?

বিষাক্ত সাপের মতন অবিরত ছোবল মারছে এই প্রশ্ন।

তবে আর কে? দুধকলা দিয়ে যাকে পোষা হয়েছে এতোদিন—সে ছাড়া আর কে? না, আর কেউ হতে পারে না। বাইরের চোর আসে নি, ঘরের চোরেরই এই কাজ।.....

টাকা নিয়েছে মাধব। নিশ্চয়ই মাধব!

দুই 'মায়ে পোয়ে' অনেক আলোচনা করতে থাকে।

আর কিছু নয়—হঠাৎ অতগুলো টাকা দেখে লোভ সামলাতে পারে নি।

কিংবা হঠাৎ হয়তো নয়—হয়তো ও-ই ওর পেশা!

সন্দেহের মতো ছোঁয়াচে রোগ আর নেই। মা'র কথায় ক্রমশঃ সুকুমারেরও ধারণা বদ্ধমূল হয়—নিশ্চয়ই বরাবর চুরি করে এসেছে মাধব, খুচরা-খুচরা বলে ধরা পড়ে নি এতোদিন।

কে আর কবে ওর কাছে হিসেব নিতে গিয়েছে?

বাজার দোকান কেনাকাটা করে যা ফিরিয়ে দেয়, তুলে রাখেন অন্নপূর্ণা, জিজ্ঞেস করেন না কখনো; কেনই বা করবেন? সুকুমারকে কি জিজ্ঞেস করেন? নিষ্পাপ মন তাঁর।

ক্রমশঃ মাধবের স্বভাবের সমস্ত রহস্য ধরা পড়তে থাকে এঁদের কাছে। তাই মাধবের দোকান বাজার করবার অতো আগ্রহ। কিছুই করতে দিতে চায় না সুকুমারকে। তাই এমন ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকে!

—কিছুদিন থেকেই ওর মতিগতি ভালো নেই...অন্নপূর্ণা বলেন, আজকাল রোজই দেখি ঠিক দুপুরটি হলেই কোথায় চলে যায়, জিজ্ঞেস করলে বলে না।

—গাঁজার আড্ডা-টাড্ডা জুটিয়েছে বোধ হয়।...মন্তব্য করে সুকুমার।

অন্নপূর্ণা বলেন—থানা-পুলিস করতে পারবো না—কিন্তু বলতে হবে তো? এখন কি করে বলবো ওকে? চোরের লজ্জা নেই, আমাদেরই লজ্জা!

সে কথাটা সুকুমারও ভেবেছে, কি করে বলবে মাধবকে? যতোই হউক—বাড়ীর লোকের মতোই রয়েছে আজ পাঁচ বছর।

আড়ালে যথেষ্ট নিন্দে করা এক, আর মুখোমুখি বলা আর।

—বলেই বা কি হবে.....সুকুমার হতাশ ভাবে বলে, পরীক্ষা দেওয়া আমার ভাগ্যে নেই মা! নইলে এমন ঘটনা ঘটে? একবার যখন গিয়েছে, আর কি বার করা যাবে? না—ও স্বীকার করবে?

অন্নপূর্ণাও বলেন, চোর কখনো সহজে চুরি স্বীকার করে না। এক উপায় পুলিসে দেওয়া। তাতেও টাকা আদায় হবে না,—শুধু হয়রানি সার।

ভগবান! সুকুমার তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিল!

শুয়ে পড়ে আবার উঠে বসেন অন্নপূর্ণা—না সুকু, চুপ করে থাকলে চলবে না; ডাক ওকে, আমি এখুনি বলবো, টাকা আমি আদায় করবো ওর গলায় গামছা দিয়ে।

ছেলের মতো যে ভালোবাসতেন মাধবকে, মাধব যে তাঁকে নিজের মা'র মতো ভাবে,—টাকার শোকে সব ভুলে যান অন্নপূর্ণা।

টাকার শোক? তাই বটে। কিন্তু পঁচাত্তরটি টাকাই তো মাত্র নয়, এ যে সুকুর জীবন মরণের সমস্যা।

ঘুম চোখে হঠাৎ অন্নপূর্ণার ডাকে চমকে উঠে মাধব।—কি বলছেন মা? কি হয়েছে?

চোখ মুছতে মুছতে উঠে আসে সে।

অন্নপূর্ণা প্রথমটা রাগ না করে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টায় কিছুটা নরম হয়ে বলেন—হ্যাঁরে মাধব, সেদিন গিনি ভাঙিয়ে যে টাকাগুলো আনলে সুকু, কোথায় সেগুলো রাখা হলো বল দিকি?

—টাকা? গিনির টাকা?.....

ঘুমের মাথায় যেন বুঝতেই পারে না মাধব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা—সুকুমার ওর ন্যাকা ভাব দেখে ধৈর্য্য রাখতে পারে না, বলে উঠে —হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা! সাদা সাদা গোল গোল চাক্তি! দেখো নি কখনো চোখে?

—আমি তা দেখি নি মা, কোথায় রেখেছেন? কেন?

—কেন? কেন আর.....অন্নপূর্ণা বলেন, সে টাকা উড়ে গেছে, আর কেন?—

—উড়ে গেছে!.....মাধবের যেন আর ঘোর ভাঙছে না।

—দেখছো মা, সাধে বলছি গাঁজা-ভাঙ ধরেছে!.....সুকুমার বলে।

অন্নপূর্ণা এবার গম্ভীর হয়ে বলেন—হ্যাঁ উড়ে গেছে! কিন্তু সত্যি তো আর ডানা হয়ে উড়ে যায় নি। কি করে গেল?

—আমি? আমি কি করে জানবো মা?.....ভয়ে মুখ সাদা হয়ে যায় মাধবের।

—তুই জানিস না, আমি জানি না, তবে কি সুকু জানবে? ওর পরীক্ষার জমা দেবার টাকা ও চুরি করেছে তা' হলে? এই তবে বলতে চাস্ তুই?

—তবে কি আমি চুরি করেছি?.....হঠাৎ ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলে মাধব।

যাক্ আর সন্দেহ থাকে না। কাঁচা চোর তো—ভয় খেয়ে গেছে।

অন্নপূর্ণা এবার কাজ হাসিলের আশায় খোসামোদ করতে থাকেন। বলেন—ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা অপকর্ম্ম করে ফেলেছিস্, কি আর হবে? দিয়ে দে টাকাগুলো। দু'-এক টাকা খরচ করে থাকিস্ তো থাক্‌গে—কিছু বলবো না তার জন্যে।

সুকুমার অতো খোসামোদের ধার ধারে না, সে তম্বি করতে থাকে।

কিন্তু মাধবের এক ভাব! খালি কোঁচার খুঁটে চোখ মুচছে আর বলছে—আমি কেমন করে জানবো। এ্যাঁ? আমাকে কি তুমি রাখতে দিয়েছিলে?

অন্নপূর্ণা অবাক্ হয়ে যান। উঃ! কী শক্ত ছেলে! কাঁচা নয়—দস্তুর মতো পাকা চোর। কিছুতেই কবুল করানো গেল না!

শেষ পর্য্যন্ত 'মরিয়া' হয়ে তিনি বলেন—আচ্ছা, তুই বা কতো শক্ত ছেলে, আর আমিই বা কতো শক্ত মেয়ে দেখবো এবার। কাল পুলিস ডেকে জলবিছুটি লাগিয়ে তোকে কবুল করিয়ে ছাড়বো। সুকুর আমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না—এ আপসোসের জ্বালা আমি ভুলবো? তোর পিঠের ছাল তুলে তার শোধ নেবো।

এতো কথার মধ্যে হতভাগা হঠাৎ মুখ তুলে বলে উঠে কি না—পরীক্ষা দেওয়া হবে না দাদার? এ্যাঁ?

আর সহ্য হয় না সুকুমারের, ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে—ন্যাকা বদমাইস? কিছু জানো না তুমি? বাড়ীতে টাকা পোঁতা আছে আমার, তাই না? কালকেই জমা দেবার শেষ দিন তা জানিস? এখনো ভাল চাস্ তো—

অন্নপূর্ণা এবারে অন্ধকার মুখে বলেন—ভালো ও কিছুতেই চাইবে না সুকু, বৃথা চেষ্টা। কাল পুলিস ডেকে তার হাতে দিয়ে দেবো ওকে; তারপর যার যা কপালে আছে।

সত্যিই—মা ডাকুন পুলিস, মাধবকে ভয় দেখিয়েও যদি—

ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে—

পরদিন সকালে যথারীতি কাজ করতে দেখা গেল না মাধবকে। শুয়েই পড়ে রইলো বেলা অবধি।

অন্নপূর্ণা আর সুকুমার দুই মায়ে বেটায় মিলে আবার সুরু করলেন একপালা।

—'মান' হয়েছে বাবুর!

—ঘোর কলি আর কাকে বলে!.....এমনি আরো খানিকক্ষণ চললো।

সেদিন অন্নপূর্ণার একাদশী। সুকুমার বললে শরীর ভালো নেই, ভাত খাবে না। রান্না আর হলো না। মাকে কিছুতেই মাধবের জন্যে রাঁধতে দিলে না সুকুমার। ওঃ! তেজ করে শুয়ে আছেন বাবু! একলা ওঁর জন্যে আলাদা করে রেঁধে পায়ে ধরে খাওয়াতে হবে?—না আর কিছু?

দুপুর-বেলা শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে সুকুমার...উঃ! কী অসঙ্গত কারণে তার সমস্ত আশায় ছাই পড়ে গেল! এখন কি করবে সে?...

এলোমেলো কতো ভাবনা, বিষম একটা আক্রোশ। এইবার উঠে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়াটাকে দূর করে দিয়ে তার অন্য কাজ!

এমন সময় গুটিগুটি ঘরে এলো মাধব।

—দাদা!

—আজ্ঞে হুজুর; বলুন!.....উঠে বসে সুকুমার।

—এই নিন টাকা। জমা দিয়ে আসুন।

—কি বললি?.....হুঙ্কার দিয়ে ওঠে সুকুমার। সঙ্গে সঙ্গে যেন 'ছোঁ' মেরে ছিনিয়ে নেয় টাকাগুলো। বোধ করি ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে থাকে মাধব।

—পুলিসের ভয়ে টাকা বেরোলো, কেমন?.....হুঁ বাবা! উঃ! এইটা যদি কাল ফিরিয়ে দিতিস, শয়তান রাস্কেল!

—এখনো সময় আছে—মাধবের গলা দিয়ে স্বর ফোটে না যেন—পাঁচটা অবধি দেওয়া যাবে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

—হুঁ, খুব বিদ্যে হয়েছে যে! হাজতের ভয়ে রাতারাতি সব শিখে ফেলা হয়েছে।...আচ্ছা, কতো আছে এতে?

—পঁচাত্তর।

—আরে! এক কাণাকড়িও পেটে যায় নি দেখছি।...যাক গে দেখি, যদি এখনো...মা মা—শুনে যাও শীগ্‌গির! ধর্ম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির টাকা নাকি চক্ষেও দেখেন নি।.....মা শুনছো—

অন্নপূর্ণা ওঘর থেকে এসে সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুকাল। তার-পর বলেন—ছি ছি মাধব, কী কেলেঙ্কারীই করলি বল দিকিন? কথায় বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!' যাক্, খুব সময়ে সুমতি হলো, তাও ভালো। পুলিসের হাতে পড়লে কী দুর্গতি হতো!

হাতের কাছে মেজেয় পড়ে এক গোছা নোট! [পৃষ্ঠা—৫৮

পুলিসের ভয়েই যে সুমতি হয়েছে মাধবের তাতে আর সন্দেহ কি!

শোনো শোনো গল্প শোনো

সুকুমার বেরিয়ে গেলে অন্নপূর্ণা মাধবের হাতে দুটো দু'আনি গুঁজে দেন—যা কিছু কিনে খেয়ে আয় মুখপোড়া, সারাদিন খাস্ নি।

ধীরে ধীরে চলে মাধব।

অন্নপূর্ণা মনে মনে হাসেন। বাবা! পেটের জ্বালা বড়ো ভয়ানক জিনিস।

টাকা জমা দিয়ে উৎফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরে সুকুমার দেখে—শোবার ঘরে মেজেয় কাঠের মতো বসে আছেন অন্নপূর্ণা। হাতের কাছে মেজেয় পড়ে এক গোছা নোট!

—এ কি মা?

অন্নপূর্ণা বোকার মতো মুখ তুলে তাকান।

—টাকা কিসের মা?

—সেই টাকা!.....এইটুকুই শুধু বলেন অন্নপূর্ণা।

—কোন্ টাকা?

—গিনির!

—কি বলছো তুমি মা? কোথায় ছিল?.....চীৎকার করে উঠে সুকুমার।

—বিছানার তলায় রেখে ভুলে গিয়েছিলাম। এই সবই রয়েছে—

আধুলিটা তুলে দেখান অন্নপূর্ণা।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে সুকুমার বলে—তবে সে টাকা মাধব কোথায় পেলো?

—জানি না।

—কোথায় সে?

—তাও জানি না, তুই চলে যাবার পরই তো বেরিয়ে গেছে।

দু'আনি দুটোর কথা আর বলতে ইচ্ছা হয় না অন্নপূর্ণার।

কিন্তু সেই দু'আনি দুটো হাতে করেই কি আবার 'বানের জলে' ভাসতে গেল মাধব?

নাঃ, ওর শোবার বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে সে দুটো—যেন অন্নপূর্ণাকে ব্যঙ্গ করতে?

শোনো শোনো গল্প শোনো

'বানের জলে' যখন ভেসে যায় মানুষ, তখন সর্ব্বস্বান্ত হয়েই ভাসে!.....

দু'দিন পরে কোথাকার যেন এক খাবারের দোকান থেকে খোঁজ করতে এলো মাধবকে। কিছু কিছু কাজ করতো নাকি তাদের দোকানে, দু'দিন যায় নি কেন?

কি কাজ? কাজ অবশ্যি সামান্যই, আলু ছাড়ানো, ময়দা মাখা, উনুনে কয়লা দেওয়া, বাসনপত্র ধোওয়া। দুপুরবেলা যায় তিন ঘণ্টার জন্যে। আট আনা রোজ।

দোকানের লোকটা বলে, মাস পাঁচ-ছয় কাজ করছে—তবে 'রোজ' নেয় না, কর্ত্তার কাছে জমা রাখে। বলে—টাকা জমিয়ে জমিয়ে একশো টাকা হলে নাকি মাষ্টারের মাইনে দিয়ে লেখা-পড়া শিখবে? শুনুন কথা? কথায় ওস্তাদ! বলে 'লেখা-পড়া না শিখলে মানুষ জন্মই বৃথা'। তা' হঠাৎ পর্শুদিন কর্ত্তার কাছে গিয়ে, দেশ থেকে মায়ের অসুখের খবর এসেছে, টাকা পাঠাতে হবে—বলে কেঁদেকেটে পড়ে ওর নিজের সত্তর টাকা আর পাঁচ টাকা হাওলাত নিয়ে চলে এলো—আর গেলো না!.....দেশে-টেশে চলে গেল নাকি? খবর জানেন? এই বাড়ীতেই তো থাকতো—বলেছিল!

এই বাড়ীতেই তো থাকতো—বলেছিল!

হুঁশিয়ার

সক্কালবেলা বাড়ীতে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

মামার ঘরের দরজার শেকলে প্রকাণ্ড এক তালা ঝুলছে। ভারীসারি মজবুত তালা! অথচ মধ্যে ঘুমন্ত মামা।

প্রথম নজর পড়লো নন্তুর, দেখেই ছুটে গিয়ে স্নানের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করে শুধালো—মা, মামাকে তালাবন্ধ করে রেখেছো কেন?

তালাবন্ধ!

শুনে তো মা'র চোখ কপালে উঠেছে। তালা-বন্ধ করে রাখা আবার কি কথা? কতো ভক্তিভাজন দাদা তাঁর,—কতো সাধ্য-সাধনায়, কতো আরাধনায় কতোদিন পরে এসেছেন দিন তিনেক থাকবেন বলে, সেই দাদাকে তালাবন্ধ করে রাখবেন তিনি?

দাদা ঘুম থেকে ওঠার আগে কোথায় এখন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিচ্ছেন, চায়ের সঙ্গে গরম নিমকি আর পাঁপর ভেজে খাওয়াবেন দাদাকে, তা নয় এই কথা!

ছেলের কথায় ধমকে উঠে বলেন—ও আবার কি ছিষ্টিছাড়া কথা? ঘুমন্ত মানুষটাকে তালাবন্ধ করে রেখেছি আমি?

নন্তু জোর গলায় বলে—তুমি না রেখেছো তো বাবা রেখেছেন। তুমি আর বাবা ছাড়া কে ছেকলের নাগাল পায়?

—আহা! তোমরা তো কিছু পারো না? কড়ি-বরগায় উঠে নেত্য করতে পারো তোমরা! তোমাদের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? আচ্ছা আমি যাচ্ছি, দেখছি কার এমন বিদ্‌ঘুটে ইয়ার্কি করবার সখ হয়েছে? তোমরা ছাড়া কেউ নয়।

—আমরা কেউ কিছু জানি না—সজোরে প্রতিবাদ করে নন্তু—সন্তু, টাবু, নেবু সবাই তো ঘুমোচ্ছে এখনো।.....বলে ছুটে যায় নন্তু ঘটনাস্থলে—পরিদর্শন করতে।

ঊষারাণী এসে দেখেন সত্যিই তো। দাদার ঘরের শেকলে প্রকাণ্ড এক তালা ঝুলছে। একদম নতুন তালা, এবাড়ীর জিনিসই নয়।

তবে? কার কাজ এ? শুধু মজা করতে—পাঁচ-সাত টাকা খরচ করে একটা তালা কিনে এনে দোরে লাগিয়ে দেবে এমন পাগল কে আছে এ-বাড়ীতে?

ঊষারাণীর চেঁচামেচি আর নন্তুর ডাকাডাকিতে একে একে সবাই এসে জড় হয় মামার দরজায়। সন্তু, টাবু, নেবু, কর্ত্তা, বামুন-ঠাকুর, ঝি-মোক্ষদা!

প্রত্যেককে ধরে ধরে জেরা করেন ঊষারাণী। কিন্তু কে দোষ স্বীকার করবে? ঘুম থেকে উঠে এসে এই দৃশ্য দেখে সকলেই তো আকাশ থেকে পড়ছে।.....চাবির কথা কে কি জানে?.....তবু সব্বাই খুঁজতে থাকে। খুঁজে খুঁজে ঘেমে যায় একেবারে, কোথাও পাওয়া যায় না।

সবাই যখন হতাশ হয়ে ফিরে আসে, তখন ঊষারাণী হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠেন—নিশ্চয় দাদাকে আমার চোর-ডাকাতে খুন করে তালা দিয়ে রেখে গেছে! ওই ঘরেই আয়রন সেফ্, ওই ঘরেই দেরাজ আলমারি, যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেও আশ মেটেনি তাদের, দাদাকে শেষ করেছে!.....ওগো দাদা গো!—কেন মরতে তোমায় আমি আসতে লিখেছিলাম গো! আমার বাড়ীতে এসে প্রাণটা হারালে তুমি!

কর্ত্তা কেবল বলেন—আরে রোসো রোসো, দেখোই আগে দাদাকে ডেকে তুলে,

অন্য চাবিতে খোলা যায় কি না দেখো। এখুনি চেঁচামেচির চোটে থানা-পুলিস করে ছাড়বে!

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ঊষারাণী দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন—খাটের ওপর গলাকাটা দাদা, রক্তে বিছানা ভাসছে, লোহার সিন্দুক ভাঙা, ঘরের জিনিসপত্র সব তচনচ!

দিব্যচক্ষেই দেখছেন, চর্ম্মচক্ষে দেখবার উপায় নেই, দোতলার ঘর! আ র—জা ন লা গু লো রাস্তার দিকে, বাড়ীর দিকে এই একটি দরজা।

মামার ঘুমটা দেশ-বিখ্যাত।

বেঁচে যদিও বা থাকেন, এসব ছোট-খাটো গোলমালে তাঁর ঘুম ভাঙবে এমন ভরসা নেই। কর্ত্তা ঢালা হুকুম দেন—যে যতো পারো

একে একে সবাই এসে জড় হয় মামার দরজায়। [পৃষ্ঠা—৬১

কীল ঘুসি লাগাও দরজায়।...অন্য চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টাটা তখন ব্যর্থ হয়েছে।

সন্তু, নন্তু, টাবু, নেবু, কর্ত্তা, গিন্নী, ঝি, ঠাকুর—কেউ বাকী থাকে না, সক্কলে একবার করে চোরের মার মেরে যায় দরজাটাকে। অবশ্য তার সঙ্গে ডাকাডাকিটাও ছোটখাটো নয়!.....'মামা' 'মামু' 'মামাবাবু' 'দাদা দাদা গো' 'ওহে শ্যালক মশাই'.....ইত্যাদি নানাবিধ সম্বোধনে বাড়ীর বাতাস রম্ রম্ করতে থাকে।

পাড়ার সমস্ত বাড়ীতে জানলায়, বারান্দায়, ছাদের আলশেয় লোকে লোকারণ্য। কী ব্যাপার ঘটলো এদের বাড়ীতে।

ওদিকে—কর্ত্তার মুখে 'পুলিস ডাকার' উল্লেখ শুনে এক ফাঁকে বামুন ঠাকুর রান্না ফেলে কেটে পড়েছে। ডাল ভাত পোড়া-গন্ধ পাড়া ছাড়িয়ে ভিন্ পাড়ায় পেঁচিচ্ছে। অবিশ্বাস করবার কিছু নেই, দু' হাঁড়ি ডাল ভাত ইচ্ছেমতো পুড়তে দিলে যে কী অবস্থা হয়, কেউ তো কোনোদিন পরীক্ষা করে দেখেনি!

নন্তু চেঁচায়—মামা, তুমি জানলার একটা গরাদে বেঁকিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ো, আমরা চাদর পেতে ধরবো।.....কোনো ভয় নেই তোমার.....চারজনে চাদরের চার কোণ ধরবো।

বোধ হয় দোতলার জানলা থেকে ওই রকম লাফিয়ে পড়ার দৃশ্য কোনো সিনেমায় দেখে থাকবে নন্তু।

সন্তু একটু কম বীরপুরুষ। দাদার প্রস্তাব শুনে আর মামার দেহের ওজন মনে করে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার, চাদরের একটা কোণ ধরতে তার ডাক পড়াও অসম্ভব নয়!

সে কাতর বচনে আবেদন করে—লাফিয়ে পড়ো না মামা, কেউ তাল সামলাতে পারবে না, চাদর ছিঁড়ে যাবে। বরং ধুতিটা গরাদেতে বেঁধে শুধু আণ্ডারওয়ার পরে ঝুলে পড়ো।

এ অবস্থাটা সে একটা 'রহস্য-মালার' বইতে পড়েছে।

কর্ত্তা ছেলেদের ধমকে ওঠেন—একটা গরাদে বেঁকিয়ে 'ঝুলে পড়বে'—লাফিয়ে

পড়বে না আর কিছু? সব গরাদেগুলো না কাটলে তোদের মামার সেই লাশ বেরোবে?

এদিকে—ঊষারাণী পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন—ওরে কেন তোরা পাগলামি করছিস্? লাফানো ঝাঁপানোর অবস্থা কি আর আছে দাদার? যা হয়েছে সে তো আমি মনে মনেই জানছি!.....তোরা গিয়ে ভালো দেখে গদি দেওয়া খাট কিনে নিয়ে আয় দাদার জন্যে, দাদা আমার বড়ো আয়েসী ছিলেন! আরাম করে ঘুমুতে পেলে আর কিছু চাইতেন না!

ঝি মোক্ষদা চোখে আঁচল দিয়ে সুর মিলায়—মামাবাবু গো, আপনি যখনই আসো—তখনই যে যাবার সময় আমাদের গোছা গোছা ট্যাকা বক্‌শিশ করে যাও, এবারে না বলে কয়ে বিনি লুটিশে কোন্ রাজ্যে চলে গেলে গো!

এমনি হৈ-হৈ কাণ্ডর মাঝখানে সাত বছরের টাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—বাবা, বাবা, ওই রাস্তা দিয়ে একটা চাবিওলা যাচ্ছে। সমস্ত চাবির কল ভাঙতে পারে ওরা।

চাবিওলা! কল ভাঙা! ওঃ সত্যিই তো, এ কথা তো এতোক্ষণ মনে পড়েনি কারুর। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি, জানলার ধারে গিয়ে ডাক দেন তাকে। লোকটা আসে।

আসে বটে, কিন্তু কিছুতেই দরজায় হাত দিতে চায় না। ঘরের মধ্যে একজন 'খুন-হওয়া' লোক আছে শুনেই বিগড়ে বসেছে সে। এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই নেবু খবরটা দিয়ে দিয়েছে কি না!

—চাবিওলা, চাবিওলা, চোর এসে মামার গলা কেটে ফেলে তালা বন্ধ করে পালিয়ে গেছে, তোমার কাছে ওর চাবি আছে?

এমন কথা শোনার পর কবে কোন্ চাবিওলা বন্ধ দরজায় হাত দিয়েছে? শুনেছেই বা কবে কে?

অনেক অনুনয়-বিনয় করে কর্ত্তা অবশেষে আস্ত একখানি দশ টাকার নোট ঘুষ দিয়ে, যদি বা রাজী করান তাকে, সে আর খুলে উঠতে পারে না কিছুতেই।

—হবে না বাবু! কপালের ঘাম মুছে বলে লোকটা—কামার ডাকতে হবে শেকলটা কেটে বার করে নিক। এ তো তালা নয় 'বজর'। আসল বিলিতি মাল।

শোনো শোনো গল্প শোনো

যে কোনো 'মাল' আসল বিলিতি হলেই ভালো হবে, এই তার বদ্ধমূল ধারণা।

...নোটখানা ফতুয়ার পকেটে পুরে চাবি ঝম্-ঝম্ করতে করতে দিব্যি চলে যায় সে।

কর্ত্তা ছোটেন কামার খুঁজতে। আফিসের বেলা পার হয়ে গেছে। উপায় কি! যার বাড়ীতে দোতলার ঘরে শ্যালা খুন হয়ে পড়ে আছে, তার কি আর ঠিক সময়ে আফিস যাওয়া সাজে?

এ তো ক্ষণে কর্ত্তাও গিন্নীর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

সত্যি আর কিই-বা হতে পারে? খুন হওয়া ছাড়া?...প্রথম তো তালা-রহস্য, দ্বিতীয় হচ্ছে এতো ডাকে ঘুম ভাঙবে না?

কিন্তু খুন হলো—হলো কি না তাঁরই বাড়ীতে? কেন পর্শু রাত্তিরে নিজের বাড়ীতে খুন হতে পারলো না?—হবে কেন? শ্যালা যে! সম্পর্কটাই বাঁকা।

চাবি ঝম্-ঝম্ করতে করতে দিব্যি চলে যায় সে

ছেলেমেয়েদের এবার শাসিয়ে রেখে যান কর্ত্তা, কামারকে আবার কিছু না বলে বসে। আরও দশ টাকা খরচা করতে পারবেন না—তিনি

একেই তো লোহার সিন্দুক রয়েছে ওই ঘরে। যথাসর্ব্বস্ব কি আর না গেছে?

কামার খুঁজে আনতে আধ ঘণ্টা কাটে।

ঊষারাণী দালানে শুয়ে পড়েছেন, ছেলেরা খিদেয় কাহিল হয়ে বসে আছে, মোক্ষদা আবার নীচে নেমে বাসন মাজতে বসেছে। কর্ত্তা এলেন ছেনি হাতে কামার নিয়ে। সে এলো, এসেই শেকলটাকে কট্ করে কেটে দিয়ে চার আনা পয়সা নিয়ে চলে গেলো।...কী ভাগ্যি! কপাট ঠেলে খুলে দেখলো না!

কিন্তু দরজা খুলে ঢুকবে কে?

রক্তগঙ্গা বিছানা মনে করে কেউ আর নড়ে না, এ ওর মুখ চায়।...শেষ পর্য্যন্ত ঊষারাণী হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে—দাদা গো—বলে ঘরের দরজা খুলে ঢুকে পড়েন।

কিন্তু এ কী? কোথায় দাদা?...বিছানা খালি! সাদা ধব্‌ধবে চোস্ত পরিষ্কার।

ঘরের একটি আলপিনও এদিক ওদিক হয়নি।

তা হলে নিরুদ্দেশ! তা ছাড়া আর কি! রাতের অন্ধকারে ইচ্ছাকৃত নিরুদ্দেশ।

কিন্তু কি দুঃখে? ব্যাচালার মানুষ; মোটা মাইনের চাকুরী করেন, খান দান ভুঁড়ি বাড়ান, এই তো কাজ। নিরুদ্দেশ হবেন কেন?

—হবেনই তো—ঊষারাণী কেঁদে কেঁদে বলেন—দাদার যে কোষ্ঠীতে সপ্তমে শনি, একেবারে অকাট্য সন্ন্যাসযোগ।

—তা'হলে—ভাগ্নেদের নামে উইল-ফুইলগুলো করে গেলেই পারতেন...কর্ত্তা খেদ করেন।

নন্তু চেঁচিয়ে ওঠে—ওমা মা, মামার চিঠি।

—চিঠি! কই? দেখি! কোথায়?—আনন্দে আবার ডুকরে ওঠেন ঊষারাণী।

—এই দেখো, টেবিলে পড়ে ছিলো। লেখা রয়েছে—'অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়াছি, ঊর্দ্ধ্বলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বৃথা অন্বেষণ করিও না।'

চিঠি লিখতে মামা চিরদিনই একটা উচ্চাঙ্গের ভাষা ব্যাভার করেন।

—হা ভগবান! তা'হলে আত্মহত্যা!...হবেই তো—দাদা চাপা মানুষ, কখনো

কারুর কাছে তো মনের কথা প্রকাশ করেন না।...ঊষারাণী নিশ্বাস ফেলেন। ভেতরে ভেতরে হয়তো কতো যন্ত্রণা ছিলো।

—তোমার কি মনে হয়? গঙ্গায় ঝাঁপ?...গিন্নী বলেন কর্ত্তাকে।

—উঁহু, ওটা মেয়েলী, ট্রামের তলায় বোধ হয়।...কর্ত্তা বলেন গিন্নীকে।

—লোহার সিন্দুক খুলে চুপি চুপি সব নিয়ে পালায়নি তো মামা?...সন্তু বলে নন্তুকে।

হঠাৎ এক সময় তিন বছরের নেবু ডেকে ওঠে—মামা মামা! এই যে মামা।... টাবু চেঁচিয়ে ওঠে—ভূ—ভূ—ভূত!

ছাতের সিঁড়ি থেকে নেমে আসছেন মামা কোঁচার আগা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে। রোদে-পোড়া বেগুনবর্ণ মুখ!...সেই মুখে একটি পরিতৃপ্ত হাসি। হাসতে হাসতে মামা বলেন—গ্রাণ্ড ঘুমটা হলো! রোদটা চড়ে না উঠলে আরো কিছু-ক্ষণ চালানো যেতো।...তোরা সবাই মিলে এখানেজটলা কচ্ছিস্ কেন রে?

—দাদা? তুমি ছাতে ছিলে?

ঊষারাণীর এর বেশী আর কিছু বলবার ক্ষমতা থাকে না।

—ছিলামই তো, কেন খুঁজছিলি নাকি? কি মুস্কিল! লিখে রেখে গেছি—খোঁজাখুঁজি করিস নে। কি করবো—অনেক যন্ত্রণা পেয়ে শেষকালে এই ফন্দী করলাম।

কর্ত্তা আর বড়ো শ্যালক বলে মান রাখতে পারেন না। কম ভোগটা ভুগলেন তিনি? আফিস পর্য্যন্ত লেট্! লেট্ ছেড়ে হয়তো বা যাওয়াই বন্ধ, ঠাকুর পালিয়েছে, রান্নাবান্না খতম হয়ে আছে।

রেগে প্রায় খিঁচিয়ে ওঠেন—তা হঠাৎ আপনার মাঝ-রাত্তিরে 'ঊর্দ্ধলোকে যাত্রা' করবার সখ হলো কেন?

বড়ো শ্যালাও আদরের ছোট ভগ্নীপতির খাতির রাখেন না, পুরোদস্তুর খিঁচিয়ে জবাব দেন—তা হবে কেন? তুমি কুটুম্ব ভাগাবার ফিকিরে, ঘরে তিন লক্ষ তেরো হাজার ছারপোকা পুষে রেখে দেবে, আর লোকে তাই হাস্য বদনে সহ্য করবে, কেমন? কেন, তোমার তাতে লোকসানটা কি হয়েছে যে এতো মেজাজ গরম? পাছে তোমরা

পৈতেয় আটকানো চাবি দেখিয়ে ছাড়েন মামা।

আমায় খুঁজে বেড়াও ভেবে সেই রাত্তিরে কাগজ খুঁজে চিঠি লিখে নিশ্চিন্ত করে রেখে গেছি। ঘরে চোর-ছ্যাঁচোড় ঢোকবার ভয়ে নিজের ট্রাঙ্ক থেকে তালা খুলে দরজায় লাগিয়ে দিয়ে গেছি! আর কি চাও হে?

পৈতেয় আটকানো চক-চকে পেতলের চাবিটা কর্ত্তার নাকের সামনে তুলে ধরে নিজের হুঁসিয়ারির প্রমাণ দেখিয়ে ছাড়েন মামা।

'নিশ্চিন্তি' মার্কা চিঠি-খানা যে ঘরে পুরে তালাবন্ধ করে রেখে গেছেন, হুঁসি-য়ারির এমন জ্বলন্ত নমুনা সম্বন্ধে শ্যালাকে হুঁস করিয়ে দেবার জন্যে, কর্ত্তা আর এক-বার হুমকি দিয়ে উঠতে গিয়ে নিবৃত্ত হন। ছেলেমেয়েরা, গিন্নী, মায় মোক্ষদা ঝি—সকলেই হারানিধি পেয়ে আনন্দে বিগলিত, এ অব-স্থায় একা তিনি আর কতো লড়বেন?

বাড়ী ঢুকতেই শ্রীমান্ গোবিন্দ চোখ পাকিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করেন—এই যে ছোট্‌কা, বলি, যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

গোবিন্দর আড়ালে তোমাদের কাছে চুপি চুপি বলি, গিয়েছিলাম সিনেমায়, কিন্তু সে আর প্রকাশ করিনে। করলে কি আর রক্ষে রাখবে গোবিন্দ?

মানে—ধ'রে মারবে কি আর? তা' অবিশ্যি নয়—কিন্তু সিনেমা দেখার অপকারিতা সম্বন্ধে লেক্‌চার যা একটি ঝাড়বে, সেটি বড়ো সাংঘাতিক।

ওর ধারণা, বাড়ীসুদ্ধ সকলকে শাসন করবার অধিকার ওর আছে। কে যে ওকে এই পোষ্টটি দিয়েছে সে ওই জানে। মোট কথা, শাসন ও করবেই।

শোনো শোনো গল্প শোনো

বোধকরি বাড়ীতে সবেধন নীলমণি ব'লেই—এত প্রতিপত্তি ওর। অতএব—আমরা শুধু এই জানি, বেয়াড়া কিছু ক'রে ফেললেও, গোবিন্দর সামনে চেপে গেলেই হ'লো।

আমি তো হরদম সিনেমা চুরি করি, মেজদার তো বরাদ্দর অতিরিক্ত চা খাবার দরকার হ'লেই রান্নাঘরের কোণ খুঁজতে হয়!.....বড়ো বৌদি অর্থাৎ গোবিন্দজননী পর্য্যন্ত ফেরিওয়ালা ডাকেন গোবিন্দর অনুপস্থিতিতে। বেশী কথা কি—বড়দাও বাজার-খরচা বেশী ক'রে ফেললে, অম্লান বদনে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম কিছু কিছু ছাঁটাই ক'রে তবে হিসেব দেন।

গোবিন্দর হিতোপদেশ বাপকেও রেহাই দেয় না কি না!

একমাত্র মা।

মানে—গোবিন্দর ঠাকুমা। তিনিই একমাত্র বেপরোয়া বাড়ীময় গোবরজল ছিটিয়ে বেড়ান, আর বার আষ্টেক চান করেন। শুচিবাইয়ের অপকারিতা সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে এলে, তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেন তাকে।

আমাদের অত সাহস নেই! তাই—গোবিন্দ কৈফিয়ৎ তলব করতেই বলি—কোথায় আর যাবো! ওই এক বন্ধুর বাড়ী।

—বন্ধুর বাড়ী? কোন্ বন্ধুর বাড়ী? নামটা শুনি?

—সে তুই চিনবি না।

—চিনবো না? বলো কি কাকা! তোমার কোন্ বন্ধুটিকে না চিনি আমি? খগেন?.....শিশির?.....নেপেন?

—না রে বাপু, ওরা কেউ নয়—এর সঙ্গে যুগ-যুগান্তর পরে হঠাৎ দেখা।

—এতোদিন সে ছিল কোথায় ছোট্‌কা?

—কোথায় আবার? নিজের বাড়ীতেই—আমি একটু ধমকের ভান করি—তা তোর এত জেরা কিসের?

—নাঃ; জেরা আর কিসের? গোবিন্দ উদাসীন-মুখে বলে—সমস্ত সিনেমা-হলগুলোয় নতুন ছবি সুরু হয়েছে, তাই যা ভাবনা।

—তুই তো চব্বিশ ঘণ্টাই সিনেমার স্বপ্ন দেখছিস।

—উপায় কি?—গোবিন্দ পরম বিজ্ঞভাবে বলে—বাজে পয়সা খরচা ক'রে সত্যি সিনেমা তো আর দেখতে যাইনা তোমাদের মতো? স্বপ্নই দেখি।

মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। পকেটে সিনেমা দেখার প্রমাণটা রয়েছে আত্ম-গোপন ক'রে। কে জানতো, বাড়ী না ঢুকতেই গোবিন্দর খর্পরে পড়বো? তাড়া-তাড়ি সিনেমা-প্রসঙ্গের ইতি ক'রে ব'লে উঠি—তা, তুই হঠাৎ এই রাতদুপুরে সিল্কের পাঞ্জাবী, মুগাপাড় ধুতি প'রে ব'সে আছিস যে?

—আর কেন! 'গেরো', ছোট্‌কা, গেরো! এখন না-কি ঠাকুমার কি এক '—তুতো' দিদির বাড়ী নেমন্তন্ন রক্ষে করতে যেতে হবে!

গোবিন্দর ঠাকুমা যে আমার কেউ নন্, তা তো নয়? তাঁর আবার কোন্ '—তুতো' দিদির বাড়ী নেমন্তন্ন রক্ষে করার দায় ঘাড়ে চাপলো তাই ভাবছি...গোবিন্দ মহোৎসাহে বলে—ঠাকুমার সেই ক্ষেমঙ্করী-দিদি গো!

—ওঃ, তাই বল্! ক্ষেমঙ্করী-মাসী। দিদি কি রে? ছোট যে! অনেক ছোট।

—তাই বুঝি? যাক্ গে, যেতে দাও ছোট্‌কা, এ জগতে কে ছোট? কে বড়ো। কিছুই না।

সুযোগ পেলেই এ-হেন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে গোবিন্দ।

—হয়েছে পণ্ডিতী! বলি, বিয়েটা কার?...

—কে জানে? তুমিও যেমন ছোট্‌কা, ও নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে? বিয়ে যারই হোক, ভোজটা নিয়ে কথা।...তবে হ্যাঁ—অবশ্যি সব বিয়ে সমান নয়, ধরো 'ক্ষেমঙ্কর'-দাদু যদি এখন আবার দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করতে ছোটেন, চপ-কাটলেট্ কি আর হবে সে বিয়েতে? হয়তো মালাইকারিই হবে না। মাংস-টাংস? সে তো স্বপ্ন!

—বাজে বকিস্ নি—তাড়া দিই আমি—বিয়ে করবার আর লোক পেলোনা কিনা —'ক্ষেমঙ্কর'-মেসো! নিশ্চয় মেয়ে ছেলে কারুর।

—হবে, হয়তো সেই কপালকাটা, নাকে-আঁচিলওলা ছেলেটারই! সে যাক্ গে —তুমি এখন তৈরি হয়ে নাও।

—আমি? আমি কি জন্যে তৈরি হতে যাবো?

আকাশ থেকে পড়ি আমি।

—যাবে না?

—তার মানে?

গোবিন্দ সিল্কের পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরে ধুতির মায়া ত্যাগ ক'রে একটা উপুড়-করা বালতির ওপর ব'সে পড়ে।

আমি কিন্তু ওর মায়ায় গলছি না বাবা। যাক্ গে একলা।

মজাটি এই—গোবিন্দবাবু বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে অত-বড় পোষ্টটা সামলালেও, বাইরে বেরোতে হলেই গার্ড চাই। সিনেমাই হোক আর ফুটবল-ম্যাচই হোক, দেখতে ইচ্ছে হ'লে এই অধমতারণ কাকা।

যে-কোনো ক্লাশ নাইনের ছেলেই বোধকরি এমন সেকেলে-কথা শুনলে হেসে উঠবে। তবে, গোবিন্দ গ্রাহ্য করে না। ও হয়তো বলবে—আজকালকার ছেলেদের কথা বাদ দাও ছোট্‌কা, যতো সব ফক্কড়ের দল।

এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে ঢের; তাই তাড়া লাগাই গোবিন্দকে, গোবিন্দ, যাবি তো যা এইবেলা, ফিরতে—বাস্ পাবি না শেষে।

গোবিন্দ একটা উপুড়-করা বালতির ওপর ব'সে পড়ে।

—আঃ ছোট্‌কা, আমি তো তৈরি। তুমি একটা সিল্কের পাঞ্জাবী প'রে এসো!

রেগে উঠে বলি, কেন, আমার কি দায় পড়েছে রে, সিল্কের পাঞ্জাবী পরতে?

—দায় কিছুই নয়—গোবিন্দ দুই হাত উল্টে গম্ভীর সুরে বলে—তুমি যদি এই বেশেই যেতে চাও চলো। তবে পাঁচজনের সামনে 'কাকা' 'কাকা' ব'লে ডাকা মুস্কিল হবে—এই আর কি!

—আরে বাবা, পাঁচজনের সামনে ডাকতে তোকে বলছে কে? মালাইকারির ওপর বিন্দুমাত্রও লোভ নেই আমার, দু'জনের ভাগের 'কারি' খেয়ে আসতে পারো তুমি, কোনো আপত্তি নেই।

—ওঃ, তুমি তাহ'লে যাচ্ছো না?

—উঁহু।

—কারণ?

—কারণ, আমার ইচ্ছে। তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? ভদ্রলোকে নেমন্তন্ন যায়?

গোবিন্দ গম্ভীরতর হয়ে বলে—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে ছোটলোক বলবার কোনো মানে হয় না কাকা, তোমাদেরই ছেলে আমি।

—তাই নাকি? জানতাম না।...যাক্, এখন ভদ্রলোকের মতো একলাই যাবার চেষ্টা করো দিকিন? কারুর সঙ্গে না হ'লে বে'রোতে পারবো না—এ কী বদ অভ্যাস!

—বাজে-বাজে কথা বোলোনা কাকা। বাবা তো একলা যাবারই হুকুম দিয়ে গেলেন—কিন্তু একলা যাইনি কেন? কারুর সঙ্গে না গেলে চলে না কেন? পথে-ঘাটে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হ'লে হাসপাতালে নিয়ে যাবারও একটা লোক চাই তো? না হ'লে পরিণামে তো সেই তোমারই কষ্ট? "শম্ভুনাথ পণ্ডিত" থেকে "আর জি কর" পর্য্যন্ত তোলপাড় ক'রে বেড়াতে হবে তোমাকেই তো? আর তো করবে না কেউ?

—হ্যাঁ, যত চোর-দায়ে ধরা পড়েছি আমি।...তা, দাদা গেলেন না কেন?

—বাবা? বাবা যে ঠাকুমাকে নিয়ে পিসীমার বাড়ী গেছেন।

—মেজদা?

—মেজকা'র তো আজ টিউশনি রয়েছে।

—বেশ! যতো দায় আমার! আমি বেচারা তেতে-পুড়ে এসে এখন রাত দুপুরে—

—হ্যাঁ, কষ্ট ক'রে সিনেমা-টিনেমা দেখে—সত্যি—

—গোবিন্দ, ফের?

—আচ্ছা বাপু, আচ্ছা। না হয় তুমি যুগযুগান্তরের বন্ধুর বাড়ী থেকেই এসেছো, কিন্তু খেতে তো একজায়গায় হবেই? বন্ধু যে খুব খাইয়েছে মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না তো?

রেগে-মেগে বলি—হ্যাঁ, সে আমার জন্যে রেঁধে রেখেছিল যে!

—সেই তো কাকা! কে কার জন্যে রেঁধে ব'সে থাকে—এক নেমন্তন্ন বাড়ী ছাড়া?.....অথচ সেই জায়গায় তুমি যাবে না। বাড়ীতে আর কবেই-বা চপ-কাটলেট্ মাংস-পোলাও হচ্ছে বলো? সামান্য একটু মালাইকারি—তাই সাতদিন আবেদনের পর কাল পেলাম বুঝি একটু।...যাক্‌গে, তোমার যখন ইচ্ছে নেই—যাই; পয়সাচারেকের মুড়ি নিয়ে আসি, বাড়ীতে তো আজ আমার চাল নেওয়া হয়নি কি না।

হেসে ফেলে বলি—তার জন্যে মুড়ি খেতে হবে তোকে?

—উপায় কি?—গোবিন্দ দার্শনিকের মতো উদাস মুখ ক'রে বলে—এত রাতে কার ভাতে ভাগ বসাতে যাবো?...তুমিও যেমন ছোট্‌কা? কপালে মুড়ি থাকলে—কার সাধ্য চপ-কাটলেট্ খায়?...কে জানে—ওরা হয়তো মাংসও করেছে—

—নাঃ, এ ছোকরাকে আজ ভোজ খেতে বঞ্চিত করলে রক্ষে নেই বোঝা যাচ্ছে। আজ যেতে না পেলে আমার পকেটে একটি বড়ো 'খাবোল' পড়বে কাল।... মাংস-পোলাও না হোক, আমার ঘাড় ভেঙে রেষ্টুরেণ্টের চপ-কাটলেট্ সাঁটবেই। তার চেয়ে বাবা নি-খরচায় আজকেই সারি।...

অগত্যা তাড়াতাড়ি ফরসা জামা-কাপড় প'রে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। রাত কম হয়নি তো।

খানিকটা গিয়েই হুঁস হয়—হ্যাঁরে, চিঠিখানা আনিস্ নি?

—কেন? চিঠি না দেখালে ঢুকতে দেবেনা কি কাকা?

—দূর পাগলা, ঠিকানাটা ভালো ক'রে দেখে নিতাম, কোন্ কালে একবার গিয়েছিলাম, মনে নেই।

—ওঃ, এই কথা!...অবজ্ঞা ঝরে পড়ে গোবিন্দর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে।—ঠিকানার জন্যে আবার ভাবনা! এগারোর এ, শিবনাথ রায়ের লেন, কালীঘাট।

—তুই ঠিক জানিস্?

—জানি না? চিঠিখানা সেদিনকে অত ভালো ক'রে পড়লাম। ঠিকানা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

—দেখ বাপু, তুই-ই জানিস। আজকেই নেমন্তন্ন তো?

—হ্যাঁ গো কাকা, হ্যাঁ; সতেরো তারিখে নেমন্তন্ন, মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। আমিই তো পত্তরটা পড়ে শোনালাম ঠাকুমাকে। তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেল!

যাক্, আর কোনো দ্বিধা থাকে না। এত ভালো ক'রে দেখে রেখেছে যখন।... এখন শুধু তাড়াতাড়ি যাওয়া।...

তা, ঈশ্বর-ইচ্ছেয় পেয়েও পেলাম বাস্খানা খুব জোর।

ফুটপাথে দাঁড়িয়েছি মাত্তর—দেখি একখানি 'তিন-নম্বর'.....গম্ভীর চালে চলেছেন কালীঘাট অভিমুখে। চড়ে বসতেই গোবিন্দ মুগাপাড় ধুতির লম্বা কোঁচা সামলে বলে—আজ কপালটা ভালোই মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয় কাকা, শুধুই চপ-কাটলেট্? না, ভেটকির ফ্রাইও?

—গোবিন্দ, পথঘাটে পাগলামি করিসনে, থাম্।

—বেশ, থামলাম বাবা।...পেটের ভেতরকার অবস্থা ঠিক জানোনা তো! পাছে ভালো ক'রে নেমন্তন্ন খেতে না পারি—তাই বিকেলে খাবারই খাইনি।

—আর, আমিই যেন ঢের খেয়েছি!

যাক্, নেমে তো পড়া গেল আন্দাজ-মতো একটা জায়গায়। মাত্র একবার

শোনো শোনো গল্প শোনো

বহুদিন আগে এসেছিলাম। বাড়ীটা তো কিছু মনে নেই। শিবনাথ রায়ের লেন যে কোথায় কে দেখিয়ে দেবে? বাড়ী থেকে মনে হচ্ছিলো, গিয়ে পড়লেই অনায়াসে পেঁছিনো যাবে, কিন্তু কালীঘাটের গলি-ঘুঁজিগুলো বিটকেল ব্যাপার! তা'তে আবার রাত্তির দশটা।

খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে শেষ অবধি হতাশ হয়ে বলি—দূর ছাই, ফিরে যাই চল।

—ফিরে যাবো?...না খেয়ে?—গোবিন্দ আকাশ থেকে পড়ে। বাস্ ভাড়া দিয়ে ফিরে যাবো? খালি পেটে? পাগল না ক্ষ্যাপা? খুঁজে বার করতেই হবে।

—তবে করো তুমি।

—আমি? আমি ছেলেমানুষ কি আর করবো? তুমিই জিজ্ঞেস করোনা রাস্তার লোককে।

সত্যি বলতে কি, খিদেয় নাড়ীপিত্তি চুঁইয়ে যাচ্ছে আমার, তার-ওপর গোবিন্দর এই আবদার! সামনেই যাকে পাই প্রায় তেড়ে গিয়ে জিগ্যেস করি তা'কে—মশাই, শিবনাথ রায়ের লেনটা কোথায়?

—শিবনাথ রায়ের লেন? কি জানি মশাই? এদিকে নয়।

লোকটা চ'লে গেল তড়বড় ক'রে। যেন ট্রেণ ফেল হয়ে যাচ্ছে।

আবার একজনকে পাকড়াই—মশাই, শিবনাথ রায়ের লেনটা কোন্ দিকে পাব?

—কি বললেন? শিবনাথ রায়ের লেন? কই মশাই? ঠিক বলছেন তো? বিশ্বনাথ রায়ের নয়?

—আছে না কি ওই নামে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই থাকি। অবশ্য বিশ্বনাথ দাসের লেনও আছে একটা।... কার বাড়ী যাবেন?

গোবিন্দ গাধা ফস্ ক'রে বলে—ক্ষেমঙ্করী-ঠাকুমার বাড়ী।

ভদ্রলোক হেসে ফেলে বলেন—বাড়ীর কর্ত্তার তো নাম আছে একটা?

অপ্রতিভ হয়ে পড়ি। নেমন্তন্ন-পত্তরখানা না দেখে আসাটা কী বোকামিই হয়েছে! আমিই-বা কী কম গাধা!

যাক্, স্পষ্ট কথাই খুলে বলি—বাড়ীর গিন্নীর সুবাদে সম্পর্ক, সেই ভাবেই পরিচয়। কর্ত্তার নামটা ঠিক—ইয়ে—মানে, বাড়ীটা হচ্ছে, বিয়ে-বাড়ী।

—ওঃ, তাহ'লে ভোম্বল-বাবুর বাড়ী যাবেন আপনারা?... তাই বলুন।

কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলি—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা বাড়ীটা—

—এই যে, এই রাস্তা ধ'রে চ'লে যান সোজা—খানিকটা গেলেই যেখানে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে—পুরনো হলদে রঙের বাড়ী। আমি বিশেষ একটু কাজে যাচ্ছি, নইলে এগিয়ে দিয়ে যেতাম।

—থাক্ থাক্, ওটুকু দেখে নেবো।...ধন্যবাদ।

—না, না, ধন্যবাদ আবার কিসের? মানুষকে মানুষে পথ দেখাবে না তো কে দেখাবে?

—কাকা, বললেই হ'তো লোকটাকে, ঠিক বাড়ীটা চিনিয়ে দিতে।

কি জানি মশাই? এদিকে নয়। [পৃষ্ঠা—৭৬

—আমি আশ্বস্ত চিত্তে বলি—দরকার কি? নেমন্তন্ন বাড়ীর দরজা চিনোতে,

পাতা-গেলাস খুরি-ভাঁড়ই তো যথেষ্ট.....আর তুই না ঠিকানাটা মুখস্থ করেছিলি গোবিন্দ?

—করেছিলাম ঠিকই কাকা, শিবনাথ আর বিশ্বনাথ কি আলাদা? কিন্তু তোমার কি ফাইন বুদ্ধি! পাতা-গেলাসের কথা আমার তো কই মনে পড়েনি।... আচ্ছা ছোট্‌কা, তোমার কি মনে হয়? এখুনি সব ফুরিয়ে গেছে?

—গোবিন্দ, এবার চাঁটি খাবি। চল তো দেখি কত খেতে পারিস? চেয়ে-চিন্তেও দেওয়াবো তোর পাতে।

—ছিঃ ছোট্‌কা, তাই বলে অত হ্যাংলা ভেবো না আমায় যে, চেয়ে-চিন্তে খাবো! হ্যাঁ, তবে যদি নিয়ে সাধাসাধি করে, খান কুড়ি চপ কি আর খেতে পারি না আমি? আর এখন তো পেটের মধ্যে যা খাণ্ডব-দাহন হচ্ছে, হয়তো গণ্ডা-দু'চ্চার পটল ভাজাই খেয়ে ফেলতে পারি।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!

'ডাইনে সোজা' 'বাঁয়ে মোড়'—সবই তো করলাম, কোথায় সেই আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য? সেই ভূরি-ভূরি ব্যক্তির ভূরিভোজনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ ভগ্ন-অভগ্ন মাটির গেলাসের স্তূপ?.....কোথায় সেই ভুক্তাবশেষ-সমন্বিত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রাশীকৃত কলার পাতা?

সরু গলির মধ্যে অন্ধকার ছায়ার মতো পুরনো খানকতক বাড়ীর সারি..... আলোর নাম মাত্র নেই।.....অতিথি-অভ্যাগতের বালাইও নেই।.....এই কি বিয়ে-বাড়ী?

দাঁত খিঁচিয়ে বলি—গোবিন্দ, সখ মিটেছে?

—সখ কি কাকা? এ যে সামাজিক ব্যাপার। ঠাকুমা তো চারটে টাকাও দিতে বলেছেন। এই নাও, তোমার কাছেই রাখো।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

আবার চারটে টাকা!

—তবে দে, ওই খোলা জানলাটা লক্ষ্য ক'রে 'তাক্' ক'রে ছুঁড়ে দে চারটে টাকা।

—কাকা, চটছো কেন? ডেকেই দ্যাখোনা একবার। এমনও তো হ'তে পারে, বড়ো রাস্তায় খুরি-গেলাস ফেলেছে।.....

—আর রাত্তির এগারোটা বাজবার আগে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে, কেমন?

—আহা, আজকাল যে ওই ফ্যাসান হয়েছে কাকা। দাংগার পর থেকে ভয় আর ভাঙলো কই লোকের?.....বিকেল থেকে খাওয়ানো আরম্ভ করেছে হয়তো।

—তবে এখন কি পাবি কচু-পোড়া?

—বিয়ে-বাড়ীতে সবই কি আর ফুরিয়ে যায় কাকা?.....এইবার করুণ হয়ে আসে গোবিন্দর কণ্ঠস্বর—চপ-কাটলেট্ অবিশ্যি নেই; বুঝতেই পারছি থাকা অসম্ভব.....কিন্তু দই, দরবেশ? পাণ্তুয়া, সন্দেশ? মালাইকারির তলানি-ঝোল? ভাঙা-চোরা লুচি চারটি? মাছের কালিয়ার আলু?

—ডেকে-ডুকে তাই তা'হলে খা তুই—বলে গট্ গট্ ক'রে ফিরে আসছি আমি —দেখি সেই পথ-প্রদর্শক ভদ্রলোক।.....'মুখে আগুন' নিয়ে ফিরছেন।

বুঝলাম হঠাৎ সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়াই তাঁর পথে বেরুবার কারণ।

—কি মশাই, খুঁজে পেলেন না, ভোম্বলবাবুর বাড়ী?.....সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে! এই তো বাড়ী।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বলে—পাবো না কেন? পেয়েছি ঠিকই, তবে আমরা ভাবছি, এত রাত্তিরে ডাকাডাকি ক'রে বিরক্ত করবো কি না।

—সে কি হে! তবে এলে কেন?

—ইয়ে—এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম—

আঃ, এত বোকার মতো কথা বলে বসে গোবিন্দ। হ'লো তো? ভদ্রলোক ব'লে বসলেন—বেশ সন্দেহপূর্ণভাবেই বললেন—কিন্তু আপনারা তো ঠিকানাটাই খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মশাই।

আমি আবার গোবিন্দর কথার ফাঁকটা রিপু করতে বসি—হ্যাঁ, খুঁজছিলাম বটে, মানে আর কি—একজন ব'লে দিয়েছিলেন—যাচ্ছো ওই দিকে—একবার দেখে এসো।—

বুঝলাম, ভদ্রলোক উত্তরোত্তর সন্দেহ করছেন আমাদের, তা' নয়তো—

কি মশাই, খুঁজে পেলেন না, ভোম্বলবাবুর বাড়ী?...[পৃষ্ঠা—৭৯

খামোকা চেঁচাতে সুরু করবেন কেন?.....আমাদের হতভম্ব ক'রে দিয়ে দরাজ গলায় হাঁক পাড়তে সুরু করেন—ভোম্বল-বাবু—ভোম্বলবাবু—! একবার শুনুন তো—

দোতলার জানলা খুলে গেল। ক্ষেমঙ্করী-মাসীর বর ভোম্বল-মেসোর ততোধিক দরাজ গলার প্রশ্ন শোনা গেল —কে-এ?

—এই, দেখুন তো এক-বার—দুটি ছোকরা আপনাকে খুঁজছে—অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি—ফিস-ফিস ক'রে কি সব বলা-কওয়া করছে নিজেরা, বোধ হয় বিশেষ দরকার আপনাকে।

চালাক দেখেছো! 'ফিস-ফিস্' কথাটা জানাবার জন্যে কেমন কায়দা করলো। আরে বাপু, আমাদের দেখে এত সন্দেহের হেতু? 'ছেলেধরা' মনে হচ্ছে?

ততক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন ভোম্বল-মেসো—

—দুটি ছোকরা?.....কে হে?

হঠাৎ একদিন খেলাঘরে ঝড় উঠলো।.....

মরিয়া হয়ে বলি আমি।—আমি কানাই।

—কে কানাই? কোথা থেকে আসছো?

বলা বাহুল্য, সবই দোতলার জানলা থেকে।

—আমরা আসছি, হাতিবাগান থেকে—আমি কানাই, আর আমার সঙ্গে—

—কে ও, কানাই? তাই বলতে হয় এতক্ষণ? দেখো দিকি কাণ্ড—

জানলা বন্ধর ও চটিজুতোর শব্দ পাওয়া গেল, অর্থাৎ নামছেন।

—কি মশাই থানায় খবর দিতে যাবেন নাকি?

গোবিন্দ তীব্রস্বরে প্রশ্ন করে পথ-প্রদর্শক ভদ্রলোককে।—বোধ হয় পৃষ্ঠবল পেয়ে!

—কেন, কেন? থানায় কেন?—বলতে বলতে 'মুখে আগুন' ভদ্রলোক টুপ করে পাশের একটি খোলা দরজার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

'ক্ষেমঙ্কর'-মেসো ও তাঁর ভাই।

উভয়েই নেমেছেন.....কি ব্যাপার বলো তো। তোমরা এত রাত্তিরে? খবর সব ভালো তো? তোমার মা—

—হ্যাঁ, সব ভালো—যাচ্ছিলাম এই দিকে—ভাবলাম—

—তা, বেশ বেশ। বসবে না কি একটু? না কি 'বাস্' ধরতে হবে?

গোবিন্দ আমায় চিমটি কাটছে.....কিন্তু আমি গ্রাহ্য করি না। পাগল তো নই।

—হ্যাঁ, 'বাস্' ধরতে হবে বৈকি। তারপর, সব ভালো তো?

—হ্যাঁ ভালো।.....কিন্তু সেদিনকে তোমরা কেউ এলে না কেন বলো তো? ভগবানের কৃপায় সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় পাঁচশো লোকের আয়োজন করেছিলাম, লোকও হ'ল বিস্তর, শুধু তোমাদের বাড়ী থেকেই কেউ না। লক্ষ্য রেখেছি, বুঝলে হে? তোমার বিয়েতে আমরা কেউ যাচ্ছি-টাচ্ছি না।

ব'লে হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন।

কিন্তু দরজার কপাটটি থেকে নড়েন না। অর্থাৎ এই রাত্তিরে যে আদর ক'রে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অতিথি সৎকার করবেন এ-আশা নেই।

—কাকা, 'বাস্' পাবো না—গোবিন্দ আমার জামার খুঁট ধরে টানে।

'মা দিয়েছেন ক'নের আশীর্ব্বাদী'—

—হ্যাঁ.....আচ্ছা, যাচ্ছি তাহ'লে—

—এসো, কিন্তু এমন সময় এলে, একটু যে মিষ্টি মুখ করাবো তার উপায় নেই। অথচ সেদিনকে এত মিষ্টি বেড়েছিল—আর-একটা বিয়ের ভোজ হয়ে যায়।...থাকতে থাকতে একদিন এলে না।

আমি আর কোনো ভণিতা না করে পকেট থেকে চারটে টাকা বার ক'রে 'মা দিয়েছেন ক'নের আশীর্ব্বাদী'—বলে তাঁর হাতের দিকে বাড়িয়ে ধরি।

—সে কি, সে কি, আবার টাকা কেন? ছি ছি, কী অন্যায়! দ্যাখো কাণ্ড! কেউ এলে না—আবার টাকা—

টাকাটা ট্যাঁকে গোঁজার পর, এই ভদ্রতার কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে দিব্যি কপাটটি বন্ধ ক'রে বিলীন হয়ে যান ভ্রাতৃ-যুগল।

—কাকা!

—কি?

—তুমি কি পাগল?

—ছিলাম না, হচ্ছি।

—টাকা দিলে কেন?

—আসবার একটা কারণ দেখাতে হবে তো?

—কি জানি—তোমাদের বুদ্ধি তোমাদের কাছে।...গোবিন্দ দুই হাত উল্টে না-বোঝার ভাব দেখায়।

—কাকা, এখন সাড়ে-এগারোটা!

—জানি।

—এখনো দ্বারিকের দোকান খোলা আছে হয়তো।

—থাকতে পারে, পকেটে পয়সা নেই একটিও।

—আমারও নেই!.....গোবিন্দর কণ্ঠ হতাশায় ভাঙা।

—বাস্ পাওয়া যাবে তো কাকা?

—না পাওয়াই সম্ভব।

গোবিন্দ আর কথাটি কয় না।

পাঁচ মিনিট.....দশ মিনিট.....পনেরো মিনিট পরে ঈশ্বরের দূতের মতো একখানি 'বাস্'। তিন নম্বর।

সারা পথ কেউই কথা কই না!

মানে—কথা কইবার অবস্থাও থাকে না। পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন হচ্ছে.....

বাড়ী ঢুকতেই বৌদি ব্যস্তভাবে বলেন—যাক, তোমরা এসে পড়েছো দেখছি।... ঠাকুর-পো, তুমি তাহ'লে চট্ করে ঠাকুর-ঝির বাড়ী চলে যাও। ওরা ডাকতে এসেছিলো, তোমার দাদা তো ওখানে ছিলেনই, আর মেজদাও চলে গেছেন।

—কেন? হঠাৎ সকলে মিলে, দিদির বাড়ী?

—আঃ। ঠাকুর-ঝির দিদিশাশুড়ী বুড়ি যে পটল তুললেন। যাও, এখন কাঁধ দাও গে। ওদের লোকাভাব!

ভাবতে পারো মনের অবস্থা?

ভাত কি গো ঠাকুর-পো? খেয়ে আসোনি?

জামাটা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলি—ভাত না খেয়ে এক পাও নড়ছি না।

ভাত! ভাত কি গো ঠাকুর-পো? খেয়ে আসোনি?

—না।

—গোবিন্দ?

—ও খেয়ে এসেছে—আরো গম্ভীরভাবে বলি আমি।

—তবু রক্ষে। তা তুমি খেলে না কেন? এখন ভাত কোথায় পাই?

—কেন আমার ভাগের ভাত কোথায় গেল?

—কী জ্বালা! ঠাকুর-চাকর—দু'জনে আর তোমার ভাত ক'টি বাড়তি খেতে পারে না? কে জানে বাবা, তুমি দুপুর রাতে এসে ভাতের আবদার করবে।

—সত্যি কাকা.....অমায়িক মুখে গোবিন্দ বলে—অত করে বললাম তখন, খেয়ে নাও দু'খানা—ঠাকুমার সেই বোন-টোন কত সাধ্য-সাধনা করলেন। তোমার যে কী

গোঁ! কি-না 'নেমন্তন্ন খাবো না'। আমার বাবা অত সাত-পাঁচ নেই.....এই যে পিসিমার দিদিশাশুড়ীর শ্রাদ্ধ! খাবো না কি? নিশ্চয়ই খাবো। না খেলে পাঁচজনে নিন্দেও তো করে।

আর সহ্য করতে পারি না, 'ঠকাস্' ক'রে একটা চাঁটি বসিয়ে দিই ফাজিল-কেষ্টটার মাথায়।—রাস্কেল বাঁদর, তুই-ই যত নষ্টের মূল। কোথায় সেই নেমন্তন্নর চিঠি, দেখি আমি।

—ওর আর দেখবার কি আছে কাকা? বোঝাই তো যাচ্ছে—১৭ই শ্রাবণকে ১৭ই আগষ্ট ধরে রেখেছিলাম। বাঙলাটা আর কিছুতেই ধাতস্থ হয় না—দু'শো বছরের পরাধীনতার ফল, এই আর-কি।...যাক গে—তুমি চট্‌পট্ এগোও পিসিমার বাড়ীর দিকে—বুড়ি এতক্ষণে পচ্‌তে সুরু করলো কি না কে জানে।...হ্যাঁ, ভালো কথা—সকালের পাঁউরুটি আনা আছে না কি, মা?.....বার করো তো দেখি!

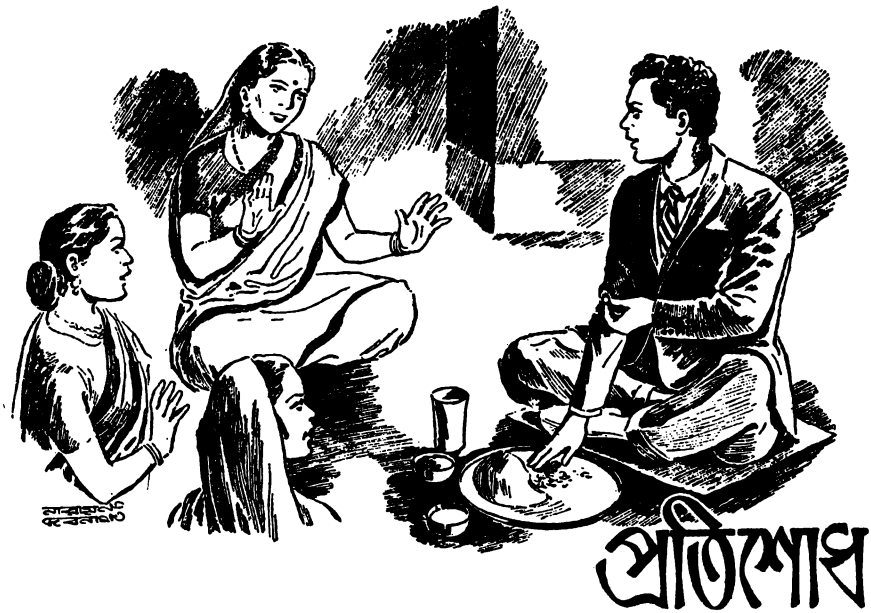

প্রতিশোধ

ছেলেটা যখন প্রথম এ-বাড়ীতে এসেছিলো—তখন রংচটা টিনের সুটকেস আর রং-জ্বলা শতরঞ্চে মোড়া দৈন্যদশাগ্রস্ত বিছানাটার সঙ্গে নিজের যে নামটা এনেছিলো সেটা রীতিমতো জমকালো।

জিনিসের দৈন্যের পরিপূরক হিসেবে নামের বাহারটা অবশ্য কাজে লাগেনি, বরং হাসির খোরাকই জুগিয়েছিলো সকলের। সময়ে অসময়ে হাসবার জন্যে সেটা মনে না রেখে যে ভুলে গেছে সবাই, এই রক্ষে।

সেই মূল নামটা ছিলো জ্যোতিরিন্দ্র ভূষণ।

নামটার ব্যাকরণসম্মত ঠিক কোনো মানে আছে কি না সে চিন্তা ছেড়ে দিলেও —অবস্থার সঙ্গে যে নেহাৎ বেখাপ্পা, আর চেহারার সঙ্গে নিতান্তই বেমানান, এটা অস্বীকার করা চলে না।

শোনো শোনো গল্প শোনো

গ্রামের ইস্কুলে 'ফ্রী' পড়ে, কলকাতার কলেজে পড়তে আসার ছুতোয় দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের ঘাড়ে এসে পড়া রোগা টিন্‌টিনে কালো মুখচোরা ছেলেটার হাতে বহরে এতো বড় একটা নাম। বাব্বা!

অতএব 'জ্যোতিটা' লুপ্ত হলো—'ইন্দ্র'ত্ব গেলো ঘুচে, রইলো শুধু 'ভূষণ'।

এই বেশ! ডাকতে সুবিধে, অবস্থায় খাপ খায়!

ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার, ধাপে ধাপে এগোতে থাকে ভূষণ, নিঃশব্দে সকলের চোখের আড়ালে।

ভূষণ কে, এ বাড়ীতে ও কেন, সে কথা এখন আর কারুর মনে পড়ে না। ও কখন খায়, কখন শোয়, কি করে আর—কি করে না, সে খবর রাখবার দায় পড়েছে কার?

দৈবাৎ কোনো দিন যদি ভাত না খেলো, বামুনঠাকুর রান্নাঘরের পাট চোকাবার সময় হাঁক পেড়ে বলে—বড়োমা, ভূষণ দাদাবাবু আজ ভাত খায় নি।

'বড়োমা' হয়তো দোতলা থেকেই বিরক্ত হয়ে বলেন—কেন? তার আবার কি হলো আজ?

ভূষণকে 'দাদাবাবু' বলে পরিচয় দিলেও সত্যিকার 'দাদাবাবুর' মতো মান্য যে তাকে দেবার দরকার নেই, তা' চাকর-বাকরেও জানে, তাই বাঙালা-জানা হিন্দুস্থানী ঠাকুর সুর টান করে বলে, কি জানি! আজ তো ওই মর্জ্জি হলো!

বড়োমা কর্ত্রীর কর্ত্তব্য সারতে—হাঁড়ির ভাতে জল ঢেলে দেবার উপদেশ দিয়ে শুয়ে পড়েন। বাস!

ভাত না খাওয়ার পরবর্ত্তী স্টেজে হয়তো তিন বেলা পরে বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা কেউ খবর দেয়—ভূষণ কলেজ ফাঁকি দিয়ে মজা করে খালি খালি বিছানায় শুয়ে আছে।

তখন ভূষণ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা সুরু হয়—ও যে নিজের দোষে রোগ করে একদিন বাড়ীর সকলকে মুস্কিলে ফেলবে, এতে আর সন্দেহ থাকে না কারুর। সাবু-বার্লির কথা একবার ওঠে, তারপর থেমে যায়। হয় বাজার থেকে আনাতে

ভুল হয়, নয়তো রাঁধতে ভুল হয়ে যায়। কিছুই যদি ভুল না হয়, হয়তো উনুনের আগুন থাকে না।

কিন্তু মজা এই, শেষ পর্য্যন্ত মুস্কিলে পড়ার সুযোগ আর কারুর হয় না।

কোনো এক বেলায় আবার দেখা যায়, রান্নাঘরের দাওয়ায় একমনে ভাত খেয়ে যাচ্ছে ভূষণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ভাতটা একটু বেশী খায়।

তবু—এ একরকম সুখের জীবন। সুখ না হোক স্বস্তির।

কেউ যে ওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না, এই ঢের। পড়ে শুনে মানুষ হবে, এই ইচ্ছেটা ভূষণের মনে এতো জোরালো হয়ে কাজ করে যে, অসুখের সময় এক বাটি সাবুর আশা করে করে ঘুম এসে যাবার সময় চোখ দিয়ে যে গরম জলগুলো উথলে পড়ে বালিশ ভিজিয়ে দেয়, সেটা আপনিই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায় এক সময়।

কিন্তু দৈবের খেয়ালে এ সুখটুকুও ঘুচলো।

ঘোচাবার জন্য দৈব প্রেরিত হয়ে যিনি এলেন, তিনি কর্ত্তার বড়ো মেয়ে সুধারাণী।

তাঁর বর মস্ত বড়ো চাকরে,—বম্বেতে থাকেন—পাঁচ-সাত বছর পরে পরে একবার আধবার বাপের বাড়ী আসেন।

তিনি এসেই—কি করে জানি না, ভূষণকে আবিষ্কার করে বসলেন। সেই হলো স্বস্তি ঘোচার গোড়া।

সুধারাণী দিন দুয়েক লক্ষ্য করে একদিন খেতে বসে বিরাট মজলিশের মধ্যে এই প্রশ্নটি ফেললেন,—ছোঁড়াটা যে তিনবেলা খায়দায়, তা গেরস্থর কি উপকারে লাগে?

শুনে সুধারাণীর মা খুড়ী পিসীমারা মুখ চাওয়াচায়ি করেন।

কি উপকারে লাগে? দেড়জনের রেশন উদরস্থ করা ছাড়া? সত্যিই তো।

কই একথা তো কোনো দিন কারুর খেয়াল হয়নি?

পিসীমা বলেন—উপকার ঘোড়ার ডিম। গেরস্থর বোধহয় আর জন্মে ওর কাছে কিছু ঋণ ছিল, তাই শোধ হচ্ছে!

—ওসব কথা বাদ দাও—সুধারাণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এই বাজারে একটা লোক পোষা অমনি? কেন চাকরটাকে বিদেয় করে দিলেই হয়? বাজার দোকানগুলো আর লাটসাহেব করতে পারবেন না?

—বাঃ! ও যে পড়ে।...খুড়ী বলেন।

—পড়ে তো তোমাদের তিনকুল উদ্ধার করবে। যে রাঁধে সে আর চুল বাঁধে না? তোমাদের এই সব বেহিসেবি কাণ্ড দেখে আমার যেন হাড় জ্বলে যাচ্ছে। রোসো কালই তাড়াচ্ছি চাকরটাকে।

সুধারাণীর মোটা শরীর, মোটা মোটা গয়না, আর বরের মোটা মাইনের দাপটে সবাইকে স্তম্ভিত করে রাখে। কেউ কথা বলতে পারে না ওর ওপর।

অতএব চাকর বিদেয় হয়।

এরপর ভূষণ থেকে 'ভূষণো'। বারবার ডাকতে হলে যা হয়ে থাকে।

—'কেন, ডাক্তারখানায় যাওয়া 'ভূষণো' পারে না?' 'রেশন আনা—ভূষণো পারে না?' 'গম পেষাই করাতে ভূষণোকে দাও না' 'বাড়ীর ছোট ছেলেগুলোর জন্য আবার পয়সা খরচ করে মাষ্টার রাখা কেন, ভূষণো সকাল সন্ধ্যে দু'ঘণ্টা পড়াতে পারে না?'

এতদিন ভূষণকে সবাই ভুলে থাকতো, সুধারাণী আর কাউকে ভুলতে দেয় না।

অনেক দুঃখে একটু সময় করে যেই পড়তে বসে অমনি তলব হয়—'ভূষণ, চট করে দুটো কাগজি লেবু নিয়ে এসো তো।' 'ভূষণ, শীগ্‌গির একপোয়া দই—তাড়াতাড়ি' 'ওহে, তোমার বই খাতা রেখে একবার এসো দিকিন এদিকে, একবার শ্যামবাজারে যেতে হবে' 'সব সময় এতো কি পড়িস ভূষণ? যা দিকিন একবার পুরুত-বাড়ী মনসার পুজোটা দিয়ে আয়'—চলছেই।

এতো দিন সবাই যে ভুলটা করে ফেলেছিলো, সেটার শোধ তুলতে যেন উঠে পড়ে লাগে প্রত্যেকে।...তা'ছাড়া চাকরের কাজগুলো করবে কে?

এছাড়া—কলেজ থেকে এসেই সুধারাণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পার্কে বেড়িয়ে আসা, সকালবেলা যখন সুধারাণী স্নান করতে যায় ওর কোলের ছেলেটাকে আগলানো, কেমন করে কে জানে ভূষণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে গেছে।

তবু চলে যায় দিন। 'মানুষ' হবার সাধনা তো সহজ নয়!

তার দুর্দ্দান্ত ইচ্ছেটা ভেতরের দুর্দ্দান্ত রাগের গলা টিপে মারে। কোথায় চলে যাবে? এই রাক্ষস শহরে কোথায় আছে একটু আশ্রয়? কোথায় মিলবে দু'বেলা দু'থালা ভাত? চলে গেলেই তো যেতে হবে গ্রামের বাড়ীতে। জলাঞ্জলি দিতে হবে লেখাপড়ার আশায়।

তার চেয়ে সহ্য করাই ভালো।...কিন্তু সুধারাণী কি টিকে থাকতে দেবে ওকে? সে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে ভূষণের সহ্যশক্তির শেষ সীমানা দেখবে।...না কি একটা নিরীহ মানুষকে উত্ত্যক্ত করাতেই ওর আনন্দ?.....দুষ্টুছেলেরা যে উৎকট আনন্দ পায় পাখীর ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে, ব্যাঙকে খোঁচা মেরে?

কিসের একটা ছুটিতে সুধারাণীর বর বিজয়বাবু এলেন শ্বশুরবাড়ী।

মান্যগণ্য জামাই, বাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে গেলো। বাড়ীসুদ্ধ সবাই ভেবে পায় না,—জামাইকে স্বর্গে রাখবে কি মর্ত্ত্যে রাখবে। বুঝেই উঠতে পারে না—কোন্ নন্দন কাননের ফল পেড়ে এনে খাওয়াবে।

অতএব—বুঝতেই পারছো—কপাল ভাঙলো ভূষণের!

তাকে অনবরত ছুটোছুটি করতে হচ্ছে—লেক মার্কেট থেকে নিউ মার্কেট, মাণিকতলা থেকে হাতিবাগান, কলেজ ষ্ট্রীট থেকে কালীঘাট, হাওড়া থেকে শিয়ালদা।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এক করে তিন রাজ্যের দুষ্প্রাপ্য জিনিস জোগাড় করে খাওয়াতে না পারলে আর জামাই-আদর কি? কুমীরের সাইজে গল্‌দা চিংড়ি—কচ্ছপের সাইজে কাঁকড়া, তরমুজ-প্রমাণ ল্যাংড়া আম, আর হাতীর ডিমের মতো হাঁসের ডিম এনে জামাইয়ের পাতে ফেলতে পারলে তবেই না বাহাদুরি!

সেই বাহাদুরির যোগান দিতে বেচারা ভূষণের প্রাণান্ত।

কলেজ কামাই হচ্ছে—তা হোক, কলেজ তো আর পালিয়ে যাবে না? কিন্তু জামাই যে পালাবে!

তিন দিন কামাইয়ের পর সেদিন ভূষণ কলেজ যাবেই প্রতিজ্ঞা করে ভোর থেকে সাত বাজার ঘুরে সারাদিনের মতো রসদ জোগাড় করে রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিল, সুধারাণী এসে অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

—ব্যাপার কি ভূষণ? এই সক্কালবেলাতেই পেট জ্বলে উঠেছে তোমার?

ভূষণ মুখ লাল করে বলে—কলেজ কামাই হচ্ছে রোজ রোজ—

—কলেজ? আজ তুমি কলেজে যাবে নাকি?

ভূষণ কুণ্ঠিত ভাবে যা বলে, তার মর্ম্ম—যখন-তখন কামাই করে করে এমাসে তার পার্শেণ্টেজ ভীষণ কমে গেছে, কাজেই আজ আর না গেলে চলবে না।

সুধারাণী আরো অবাক হয়ে বলে—ইস্কুল (ইচ্ছে করে 'ইস্কুলই' বলে সে) না গেলে চলবে না—আর সারাদিন বাড়ী না থাকলে চলবে? তুমি যে অবাক করলে ভূষণ!

—সব তো এনে রাখলাম!.....নেহাৎ নরম হয়ে বলে ভূষণ।

শুনে কিন্তু বেজায় হেসে উঠে সুধারাণী; বলে—এনে রাখলে কি বলো? বেলা আড়াইটের সময় যে তোমাদের জামাইবাবুর আইসক্রীম সন্দেশ আর ঠাণ্ডা দই খাওয়া অভ্যাস, সেটাও এনে রেখেছো নাকি? তা হলে রেফ্রিজারেটারও এনেছো বোধ হয় একটা—?

ভূষণের কেমন রাগ হয়ে যায়। তবু অনেক কষ্টে সামলে বলে—দু'সের বরফ আনা আছে—তাইতে বসিয়ে রাখলে চলবে না?

—ভদ্রলোকের চলে না। তোমাদের 'নালতেপুরের' জামাইয়ের চলতে পারে, যাক এসে পড়েছে যখন তোমাদের হাতে, তোমাদের দয়ার ওপর নির্ভর!...খেয়ে উঠে ওঁর জুতো দু'জোড়া একটু বুরুশ চালিয়ে রেখে যেও দিকিন।

শোনো শোনো গল্প শোনো

হঠাৎ ভূষণ একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসে। খেতে খেতে জলের গ্লাসে হাত ডুবিয়ে উঠে পড়ে, বলে ওঠে—আমি পারবো না।

—পারবে না?... সুধারাণী যেন তামিল ভাষা শুনছে—পারবে না কি গো? ওই টুকুতে তোমার লেট্ হয়ে যাবে?

—লেট্ হওয়ার কথা নয়—জুতোটুতো ঝাড়তে পারবো না আমি।

—কী অনাছিষ্টি কথা ভূষণ? বড়ো ভগ্নীপতি গুরুজন—তার জুতোয় হাত দিলে এতো অপমান হবে তোমার?... সুধারাণী যেন আকাশ থেকে পড়েছে! —তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায় বাপু! যাও যাও বেশ ভালো পালিশ হয় যেন দেখো।

—কেন মিথ্যে বলছেন সুধাদি, আমি পারবো না।...বলে ভূষণ চলে যায়। যতো পারে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, না যদি

পারবে না?...সুধারাণী যেন তামিল ভাষা শুনছে—

আর সুধারাণী যেন ফেটে পড়ে।

পারে—এই দণ্ডে যেন পথ দেখে ভূষণ। অতো যার টনটনে মান, তার পরের বাড়ীর ভাত খেয়ে থাকতে হয় না।...কই দু'বেলা দু'গামলা ভাত সাঁটতে তো লজ্জা করে না?.....কাজ করতেই বুঝি যতো লজ্জা?

ঘণ্টাখানেক ধরে রাগের জের চলে সুধারাণীর!

বাড়ীতে মা ঠাকুরমাও সাহস করে কিছু বলতে পারেন না। মেজাজি মেয়ে ...বড়োলোক জামাই...এখুনি হয়তো রাগ করে চলে যাবে। ওরা প্লেনে চড়ে যায় আসে—সোজা কথা?

মেয়ে জামাই থাকলো।

কিন্তু ভূষণ সেই যে গেল আর ফিরলো না।

মানুষ হবার সাধটা তার এতো দিনে ঘুচলো বোধ হয়।

যাক্ ভূষণ গেলো—তার জন্যে কারুর এতো কিছু মায়া উথলে ওঠেনি। গেলো তো গেলো। কিন্তু তার সঙ্গে—বড়োলোক জামাইয়ের আটশো টাকা দামের হীরের আঙ্‌টিটা যে গেলো!

একটু আগেই চৌবাচ্চার পাড়ে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিলেন বিজয়বাবু, তারপরেই ভূষণ গিয়েছিলো স্নান করতে।

দু'গামলা ভাত সাঁটতে তো লজ্জা করে ন

শোনো শোনো গল্প শোনো

ত্রিভুবন খুঁজে সে আঙ্‌টি তো আর পাওয়া গেলো না!

তবে? কে নেবে সে জিনিস ভূষণ ছাড়া?

হিসেবে কি বলে? দুই আর দুইয়ে চার-এর মতো নিশ্চিত নয় কি?

স্তম্ভিত হয়ে গেলো সবাই! ভূষণ! এমন কাজ ভূষণের দ্বারা সম্ভব? এ যে নেহাৎ অবিশ্বাস্য! কিন্তু লাফালাফি করতে লাগলো সুধারাণী।

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষলে যে কি হয় তাই বোঝাতে লাগলো সকলকে ডেকে ডেকে। ভূষণকে জেলে না পুরে ছাড়ছে না, এ প্রতিজ্ঞাও করতে ছাড়লো না।

তবে হলো না কিছুই।

বিজয়বাবুর ছুটি ফুরিয়েছিলো—চলে গেলেন।—'সামান্য' আটশো টাকার জিনিসটার জন্যে মাথা ঘামাবার মতো সস্তা মাথা তাঁর নয়।

যাবার সময় সুধারাণী বারবার বলে গেলো, ভূষণ যদি কোনো দিন এ বাড়ীর ছায়া মাড়ায় তা হলে যেন গলায় গামছা দিয়ে আঙ্‌টি আদায় করা হয়।

কিন্তু কোথায় বা ভূষণ, আর কোথায় বা তার গলা! কতো গামছা ছিঁড়লো বাড়ীর, ভূষণের গলায় ওঠবার সৌভাগ্য আর হলো না কোনোটার।

দিন.....মাস.....বছর।

কতোগুলো বছর কেটে গেলো, ভূষণের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না।

পৃথিবী ঘুরছে.....ঘুরছে মানুষের ভাগ্য।

যে উপরে ছিলো সে নেমে পড়েছে নীচে.....নীচের তলার জীব জায়গা করে নিচ্ছে উপরে।

সুধারাণী আজ নিতান্ত দুঃখী।

অনেক দিন হয়ে গেলো—প্লেন-দুর্ঘটনায় পা ভেঙে গিয়ে চাকরিটি গেছে বিজয়বাবুর, সপরিবারে তিনি এখন শ্বশুরবাড়ীর গলগ্রহ।

যখন টাকা ছিলো অনেক, তখন বাবুয়ানা ছিলো অগাধ। কাজেই জমানো

টাকা কিছুই ছিলো না, এখন একেবারে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। বলতে হবে না বোধ হয়—হাতীর ডিমের মতো হাঁসের ডিম এখন ঘোড়ার ডিমে পরিণত হয়েছে। বেলা আড়াইটের সময় 'আইসক্রীম সন্দেশ' আর 'ঠাণ্ডা দই'? শীতকালে ল্যাংড়া আম, আর গরমকালে কপি কড়াইশুঁটি? সে কি রূপকথার গল্প? না কি স্বপ্ন?

ভূষণের চাইতেও দুরবস্থা আজ সুধারাণীর পনেরো বছরের ছেলেটার। বাড়ীর সমস্ত কাজ না করলে মামাদের ধমকে ধমকে তার পেটের পিলে চমকে যায়।

বামুন ঠাকুরকে জবাব দেওয়া হয়েছে, দুটি বেলা রান্না ঘাড়ে পড়েছে সুধারাণীর। 'বাজার' তো ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আর ক্রমেই চালাক হয়ে উঠছে লোক। ছোটয় বড়োয় সাত-আটটি মানুষকে পোষা যে সহজ নয়, সে কথা আর কারুর বুঝতে বাকী নেই। তা ছাড়া—নিজের মা-বাপ গেছেন মারা। এখন আবার মেয়েটা এতো বড়ো হয়েছে যে বিয়ে না দিলেই নয়।

কিন্তু কে দেবে বিয়ে? কার গরজ পড়েছে?

মেয়ের বিয়ে তো আর সহজ কথা নয়! লুকিয়ে চোখের জল ফেলে সুধারাণী, আর ভগবানকে ডাকে।

এমনি একদিনে হঠাৎ অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

বললে হয়তো নেহাৎ বানানো গল্পের মতো শোনাবে, কিন্তু সত্যি ঘটনাও অনেক সময় গল্পের চেয়ে অসম্ভব হয়।

সুধারাণীর ছেলে দু'হাতে বাজারের থলে আর তেলের ভাঁড় নিয়ে বাড়ী ঢুকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—বড়োমামা, আপনাকে একজন ডাকছেন।

—কে ডাকছে?.....বলে বড়োমামা এগিয়ে এলেন।

—জানি না। মনে হলো যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক চিনলাম না। মস্তো গাড়ী করে এসেছেন—

'মস্তো গাড়ী' শুনে বড়োমামা ব্যস্ত হয়ে ছোটেন। আর কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীতে একটা সোরগোল ওঠে—জ্যোতিরিন্দ্র এসেছে.....জ্যোতিরিন্দ্র.....

জ্যোতিরিন্দ্র? কে সে? কই, কারুর তো মনে পড়ছে না। চাপাগলায় বলাবলি হয় 'ভূষণ! 'ভূষণ, ওঃ!' তাই বটে, ভূষণের ভালো নামটা জ্যোতিরিন্দ্রই বটে। —এতো বড়ো গাড়ী চড়ে এতো দামী সুট পরে যে এতো দিন পরে দেখা করতে এলো, তাকে কি আর ডাকনামে ডাকা চলে?

অতএব—জ্যোতিরিন্দ্র! বলতে ভারিক্কী, অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লেগে গেছে—যেন ভূষণের বাড়তি দু'খানা ডানা গজিয়েছে।

—কে ডাকছে?...বলে বড়োমামা এগিয়ে এলেন। [পৃঃ—৯৫

বড়োদালানে খেতে দেওয়া হয়েছে ভূষণকে, বাড়ীর মধ্যে সব থেকে ভালো আসনটা পেতে। এতো কম সময়ের মধ্যে যতোটা আয়োজন করা সম্ভব, ত্রুটি হয়নি তার।

সুধারাণীর খুড়ীমা, জেঠীমা, পিসীমার দল চারদিকে ঘিরে বসে 'এটা খাও' 'ওটা খাও' করছেন, আর নানা ছলে গল্প করছেন—জ্যোতি হঠাৎ ওরকমে

চলে যাওয়ায় কী সাংঘাতিক দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন তাঁরা, আর কী মনোকষ্টই পেয়েছিলেন!

একেবারে ঘরের ছেলের মতো--তাকে হারিয়ে কষ্ট হবে না?

কম খোঁজাটাই কি হয়েছিলো?.....কি করে জানবেন, হঠাৎ সে দেশ ছেড়ে চলে গেছে—একেবারে মাদ্রাজে।

শুনতে শুনতে ভূষণ হঠাৎ মুখ তুলে হেসে বলে—আমি চলে যাওয়ার পর আর কিছু খোঁজেননি আপনারা? মনে পড়ছে না?

চমকে উঠে সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করে।.....

মনে পড়ছে বৈ কি।.....প্রত্যেকেরই মনে পড়েছে সেই আঙ্‌টির কথা.....কিন্তু এখনকার জ্যোতিকে—ভূষণ বলে ভাবতেই পারা যায় না যে!.....তাই মনের কথা মনেই চাপা দিতে হয়েছে।

খেতে খেতে বাঁ হাতে পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে ভূষণ। আর কিছুই নয়—সেই আঙ্‌টি। বলে—চিনতে পারছেন?

কী সর্ব্বনাশ! সত্যিই সে আঙ্‌টি তবে নিয়েছিল ভূষণ?.....বিস্ময়ে বাক্য-হারা হয়ে গেছে সবাই!

ভূষণ কিন্তু সকলকেই আরো অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠে, বলে—কি ভাবছেন? চোরটার সাহস তো কম নয়? দশ বছর পরে সেই চোরাই মাল নিয়ে আবার এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে সাহস করেছে? তাই না?

—'না না, সে কি,'—'আমরা তো—ইয়ে—' --'মোটেই আমরা----'

—বাঃ! কেনই বা সন্দেহ করবেন না? আমিও গেলাম—হাজার টাকা দামের আঙ্‌টিটাও হাওয়া—কার না সন্দেহ হয়?...কিন্তু বলুন পিসীমা, তখন যদি আমি এসে বলতাম—অসাবধানে পড়ে থাকতে দেখে মজা করে লুকিয়ে রেখেছিলাম ওটা, বিশ্বাস করতেন আপনারা? কক্ষণো না। নিশ্চয় ভাবতেন—লোভের বশে চুরি করে ফেলে এখন সামলাতে পারছে না ছোকরা। তাই কি না বলুন? এখন বিশ্বাস করবেন জানি, তাই আনতে ভরসা হলো।.....বলে হো—হো করে হাসতে থাকে ভূষণ।

এতক্ষণে আর সকলেও হেসে ওঠে তার সঙ্গে, যেন ভারী একটা মজার কথা হয়েছে।

খাওয়া হলে ভূষণ বলে—কিন্তু সুধাদি এখন আছেন কোথায়? আসলে যার জিনিসটা—

সুধারাণীর খুড়ীমা, যিনি মোটেই দেখতে পারেন না সুধারাণীকে, তিনি ঠোঁট উল্টে বলে ওঠেন—কোথায় আর যাবেন—এইখানেই আছেন। কেন ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলে না? ওই তো মুকুল—সুধার বড় ছেলে।

মুকুল! ভূষণ চমকে উঠে—সেই মুকুল! সেই ফরসা ধবধবে মোটাসোটা হাফ প্যাণ্ট-পরা ছোট্ট ছেলেটা! এই রোগা কালো ময়লা কাপড়জামা-পরা! কেন?

সুধারাণীর খুড়ীমা বলেই চলেছেন এদিকে—এই দেখো না এখনকার দিনে সাত-আটটা মানুষকে পোষা। জামাই তো এ্যাক্সিডেণ্টে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে পড়ে আছেন আজ ছ'-সাত বছর। সবই আমাদের চালাতে হচ্ছে। সোজা খরচ! কি বলবো—যেমন স্বভাব তেমনিই হয়েছে। জানতো সুধাকে? কী রকম অহঙ্কার ছিলো? এখন একেবারে—

—থাক্ খুড়ীমা.....কই সুধাদি? বলে ভূষণ আন্দাজীই চলে আসে রান্নাঘরের দোরে।

কিন্তু কোথায় সুধা? রান্নাঘরের কোণে বসে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদছে কেন?

ময়লা ছেঁড়া শাড়ী-পরা, হাতে একগাছি মাত্র চুড়ি, রোগা কালো এই মানুষটাই কি সুধারাণী?—মোটা শরীরে মোটা মোটা গহনা পরে যে অহঙ্কারে ফেটে পড়তো?

কিন্তু ভূষণেরও কি সুধারাণীর খুড়ীমার মতো আনন্দ হবে—অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ হয়েছে দেখে?

'মানুষ' হবার জন্যে যে চিরদিনের সাধনা ছিল তার! সবই বৃথা হবে?

ভূষণ দরজার কাছ থেকে একটু সরে এসে ডাকে—ও সুধাদি, আপনি যে বেরোচ্ছেনই না? কী এত কাজে ব্যস্ত?

শোনো শোনো গল্প শোনো

সুধারাণী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

ভূষণ নমস্কার করে হেসে বলে—খুব মেয়ে তো আপনি? এই দশ বছর ধরে রাগ পুষে রেখে দিয়েছেন?

সুধারাণী অপ্রতিভ হয়ে বলে—রাগ কি বলো ভূষণ? তোমার কাছে মুখ দেখাবার মুখ আমার কই ভাই? যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে—

—থাক থাক হয়েছে—ভূষণ থামিয়ে দেয়—তবু ভালো যে আমার পুরানো নামটা আপনি একটু মনে রেখেছেন। এসে পর্য্যন্ত 'জ্যোতি' 'জ্যোতি' শুনে শুনে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার কথাটা তো দেখছি মন্দ নয়? চুরি করে ভেগে পড়লাম আমি, আর লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আপনার? ...বেশ!...দেখুন, আমার তো লজ্জার লেশ নেই! দিব্যি এলাম—চর্ব্ব্যচোষ্য. খেলাম।...কিন্তু সুধাদি, এতো ভালো ভালো রান্না শিখে কেবল মাত্তর নিজের ভাইদের খাওয়াতে হয় বুঝি? ভূষণো হতভাগার ভাগ্যে হবে না?...চলুন এবার এই ভাইটির কাছে!...উঁহু—কোনো আপত্তি শুনবো না। ছেলেমেয়ে জামাইবাবু সব্বাইকে ধরে নিয়ে পালাবো, দেখি কেমন না গিয়ে

ও সুধাদি, আপনি যে বেরোচ্ছেনই না? [পৃঃ—৯৮৮

থাকতে পারেন?...আচ্ছা, আজ যাচ্ছি—কাল ঠিক হয়ে থাকবেন কিন্তু! আমি বড়দাকে পিসীমাকে বলে-টলে ঠিক করে রেখে যাচ্ছি...ছোট ভাইটির যে মা নেই সেটা মনে না রাখলে চলে? এলোমেলো সংসারটা গুছিয়ে দেবে কে?

*　　*

দশ বছর আগে একদিন এইখানে—এই দালানে দাঁড়িয়েই কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিল ভূষণ—ভবিষ্যতে একদিন সে মানুষ হয়ে বড়লোক হয়ে সুধারাণীর ব্যবহারের উচিত শোধ নেবে!

সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হলো ভূষণের? তাই মুখে তার এমন প্রসন্নতা?

সত্যই সে তা হলে—মানুষ হয়েছে? হয়েছে বড়লোক?

আকাশের স্বাদ

বেলা বারোটা বাজে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ্দুর।

ভাতের মাড়-লাগানো সাবানে-কাচা ট্রাউজারটা একটা ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর ফেলে ঘসে-ঘসে ইস্ত্রী চালাচ্ছিলো বিশু।

ভাত খেয়ে উঠে কাজটা করতে সত্যিই কষ্ট হয়, কিন্তু সকালের দিকে কিছুতেই যদি সময় হয়!

ভোরবেলাই তো ছুটবে ছেলে পড়াতে। তাও ভাগ্যগুণে এমন একটি ছাত্র জুটেছে তার, যে, নাস্তানাবুদ হয়ে যায় বেচারা। সেটি তো ছেলে নয়,—একটি বিচ্ছু। সেইটিকে পড়িয়ে, গলদঘর্ম্ম হয়ে বাড়ী এসে—বাজার যাও, কয়লা আনো, তেল নুন আর গুড় কিনতে ছোটো, ডাক্তার-বাড়ী যাও, ছোট ভাইকে পড়া ব'লে দাও —কি নয়? রেশন আনার দিন হ'লে তো আরো চমৎকার!...এরপর—সারাটা দিন রোদে ঘুরে-ঘুরে চাকরি খোঁজা।

শোনো শোনো গল্প শোনো

বাঁচতে আর ইচ্ছে করে না বাবা!

বাঁচার ইচ্ছে ফুরিয়ে গেলেও, প্যাণ্টের ইস্ত্রীটা বেশ নিখুঁৎ করেই করে বিশু। প'রে বেরোলে—যাতে ধোবার বাড়ীর ব'লে মনে হয়। ইস্ত্রীর লোহাটা আর-একটু তাতিয়ে নিলে হয়তো কাজটা কিছু সহজ হতো, কিন্তু সময় নেই... সাহসও নেই।

রান্নাঘরে ধর্ণা দিতে গেলেই সুহাসিনী তেড়ে মারতে আসবেন। মা'র সেই মেজাজ মনে করলেই গায়ে জ্বর আসে বিশুর।

অতএব—তাতের ত্রুটিটা পূরণ ক'রে নেয়, হাতের জোরে।

আর ঠিক এই সময়েই সুহাসিনী এসে হাজির হন।

বুকটা দুরদুর করে উঠে বিশুর, আহা, আর দু'মিনিট পরে যদি আসতেন রে! জানে তো সে, এই কাজটা দু'চক্ষুর বিষ সুহাসিনীর।

বিশুর ধারণাটা ভুল নয়—

সুহাসিনী ঘরে ঢুকেই জ্বলে উঠে বললেন—এখনো ব'সে-ব'সে ওই হতচ্ছাড়া কাজ হচ্ছে? যত ব্যস্ত ভাত খাবার সময়, কেমন?...বলি—তোর শরীরে কি লজ্জার লেশ নেই বিশে?...সংসারের এই হাড়ির হাল, ছোট ভাইবোনগুলোর অঙ্গে ছেঁড়া ন্যাকড়াও জুটছে না, আর তুমি লাটসাহেব মট্‌মটে 'ইস্তিরি'-করা পেণ্টুলেন প'রে বাবুয়ানা করছো?...পথে বেরোলে—পাড়ার লোকে তোর গায়ে মুঠো ক'রে ধুলো দেয়না কেন তাই ভাবি!

তা' বলে কেউ যেন না ভাবে, সুহাসিনী বিশুর সৎমা।

অমনি জিভের ধার সুহাসিনীর। ছেলে-মেয়ে তো সম্ভব কথা—পাড়াপড়শী, আত্মীয়-বন্ধু, মায় ভগবানকে পর্য্যন্ত ছেড়ে কথা কন্‌না সুহাসিনী। বলতে সুরু করলে—রক্ষে নেই।

বিব্রত বিশু, মা'র অগ্নিমূর্ত্তির দিকে তাকাবার ভরসা পায় না, তাড়াতাড়ি হাতের কাজ গুটোয়।

সত্যি—এ তার এক ভীষণ দুর্ব্বলতা। মা যতই রাগ করুন, দুঃখী সেজে বাইরে বেরোতে কিছুতেই পারে না সে। তা নইলে—এমন-কিছু অফিসারের চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে না সে, যে—ফর্সা সুট না প'রে গেলে চলবে না। বরং উল্টোই—যেমন তেমন একটা চাকরি পেলেই বর্ত্তে যায় বিশু!...ওর অনেক বন্ধুকে দেখেছে, ময়লা ছেঁড়া সেলাই-করা যেমন-তেমন ধুতি সার্ট প'রে অফিস যায়, দেখলে ভারী খারাপ লাগে ওর।

কেন? হলেই-বা গরীব।

গরীব ব'লে কি গায়ের ওপর তার টিকিট মেরে বেড়াতে হবে? সেও কিছু আর দু'পাঁচশো খরচা ক'রে সভ্যতা বজায় রাখছে না? দুটো মাত্র পোষাক সাড়ে তিন বছর ধ'রে তো চালাচ্ছে! কাপড়টা খুব ভালো ছিল তাই এভাবে চলছে এখনো।

শুধু কিছুটা পরিশ্রম। 'কিছু' অবশ্য নয়, 'বেশ-কিছুই'।

সারাদিন খেটে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও—রাতারাতিই সাবান লাগাতে হয়, দড়িদড়া টাঙিয়ে শুকিয়ে নিতে হয় বুদ্ধি ক'রে; সুহাসিনীর কাছে মিনতি ক'রে ভাতের ফেনটা ফেলে না-দেবার আবেদন করতে হয়, আর ইস্ত্রীটা তাতিয়ে নেবার জন্যে তাল খুঁজে বেড়াতে হয়, কখন জ্বলন্ত উনুনটা খালি যাচ্ছে। এত কাণ্ড ক'রে একটি ফর্সা সুট পরা!

এই!

এইতেই সে মস্ত বাবু!

এর জন্যে সুহাসিনীর মুখনাড়ার আর অন্ত নেই।

যেন ছোট ভাইবোনদের বঞ্চিত ক'রে একাই সে সব খাচ্ছে-পরছে।...যেন বিশুর 'হালটা' হাড়ির মতো ক'রে ফেললেই সংসারের হালটা ফিরে রাজার মতো হবে।

নিজের ছেলের ওপর এত আক্রোশ কেন তাঁর?

বিশু একটু মস্‌মসিয়ে চলাফেরা করলেই গস্‌গসিয়ে ওঠেন কেন?

ভাই-বোনদের অমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক'রে রাখাই কি সাধ বিশুর? সংসারের হাড়িটা হালটা ফেরাবার ইচ্ছে কি—তারই করে না?

কিন্তু, করবে কি?

টাকা কোথায়?

টাকা কোথায়?

পথে ঘাটে হাটে বাজারে...দিনে-রাত্রে অহরহ এই কথা ভাবে বিশু...টাকা কোথায়?...টাকা চাই! অনেক টাকা! যাতে মা'র মেজাজ ঠাণ্ডা হয়, আর হয়—সবদিকের সৌষ্ঠব।

বাবা থাকতে—

কী সুখের অবস্থা ছিল তাদের! অন্তত বিশুর পক্ষে।

বড়লোক না হোক, ভদ্রলোক।...বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে সমস্ত সংসার যেন চারদিক থেকে দাঁত খিচোতে সুরু করেছে। টাকার অভাবে—দিন-দিন যেন ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে তারা।

অথচ বাবার মতো রোজগার করবার ক্ষমতা বিশুর কোথায়?

শিখলেই-বা কি?

ডাক্তার হবার সাধ ছিল তার, সাধ ছিল ইঞ্জিনীয়ার হবার। কত কী-ই ভালো-ভালো সাধ ছিল!

কিচ্ছু হলো না।

আর, হবেও না কিছু। নিজের ওপর আর কোনো আশা নেই বিশুর।

তবু টাকার ভারী দরকার!

অথচ—পৃথিবীতে কত টাকা!

আচ্ছা, এই কলকাতাতেই কত হাজার-হাজার-কোটি টাকা আছে?...আন্দাজ করতে গেলে, অকূল-সমুদ্রে প'ড়ে যেতে হয়।...পথে বেরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে

দ্যাখে বিশু—শুধু টাকার ছড়াছড়ি। কলকাতার জল-স্থল আকাশ-বাতাস ভরাট হয়ে রয়েছে টাকার বাষ্পে, নেই শুধু বিশুর পকেটে। বাষ্পও নেই।

সেই সমস্ত বাষ্প মেঘের মতো আস্তে-আস্তে জমাট হয়ে উঠেছে...জমা হচ্ছে ভাগ্যের বরপুত্রদের পকেটে।...সেই টাকার মেঘ তারা দু'হাতে বৃষ্টি করছে—কলকাতার পথে-ঘাটে। তাই চারিদিকে এত বাড়াবাড়ি, এত ঘটা।

আচ্ছা—হঠাৎ একদিন যদি কেউ এই সমস্ত টাকা একসঙ্গে জড়ো করে? আর জড়ো করে সমস্ত মানুষগুলোকে? আলাদা ক'রে ফ্যালে মানুষ আর টাকা? তারপর—নির্ভুল হিসাবে সমান-সমান ভাগ ক'রে দেয় প্রত্যেকটি লোককে?

কি হয় তাহলে?

বিশুর ভাগে কত পড়ে?

সে টাকায় একসঙ্গে অনেক জোড়া কাপড় কিনে দেওয়া যায় না মাকে? যে কাপড়ের অভাবে বিধবা সুহাসিনীকে দিনের তিন ভাগ সময় কাটাতে হয়—মান্ধাতার আমলের একখানা ছেঁড়া কুটিকুটি তসরের শাড়ী প'রে!

সে টাকায়—ছোট ভাইবোনদের দুর্দ্দশা ঘোচানো যায় না?...কেনা যায় না—জামা-জুতো? খেলনা-খাবার? দুধ-ফল? টনিক-ওষুধ?

ভাবতে গেলে—বিরাট মিছিলের মতো সারি-সারি ভীড় করতে থাকে অজস্র প্রয়োজন...মশারি থেকে—জুতোর কালি, ওয়াটার প্রুফ্ থেকে—টুথপেষ্ট, সর্বদিকে অভাবের দাঁত।...এই দাঁতের কামড়ে-কামড়ে সুহাসিনী দিন-কে-দিন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, ছোট ছেলে-মেয়েগুলো হচ্ছে অভব্য বেয়াড়া, আর বাইশ বছর বয়সেই বিশু জরাজীর্ণ বুড়ো।

তবু দিন কাটতে থাকে।

ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে-শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দ্যাখে বিশু। স্বপ্ন দ্যাখে লটারির টিকিটের...স্বপ্ন দ্যাখে হঠাৎ কোনো অজানা আত্মীয়ের কাছ থেকে পেয়ে

শোনো শোনো গল্প শোনো

যাওয়া মোটা টাকার সম্পত্তির...আর স্বপ্নভাঙা দুপুর-রোদে ঘুরে বেড়ায় যেমন-তেমন একটা চাকরির চেষ্টায়।

এদিকে সুহাসিনী ছেলের চাকরির জন্যে নিয়মিত মানত করতে থাকেন, কালী, দুর্গা, সত্যনারায়ণের। মানত করেন—পুরো পাঁচসিকের হরির লুটের!

এত সাধনা—ভগবান মুখ তুলে না চেয়ে পারেন?

সাধনার সিদ্ধি হয় একদিন।

যে সুহাসিনী হাসতে প্রায় ভুলেই গেছেন, তিনি হঠাৎ একদিন একগাল হেসে একখানা চিঠি হাতে ক'রে এসে ছেলেকে বলেন—বিশু রে, ভগবান বুঝি মুখ তুলে চাইলেন!

মার হাসিমুখ দেখে বিশু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করে—কি মা? কার চিঠি?

—কি মা? কার চিঠি?

শোনো শোনো গল্প শোনো

—এই তোর রমা-মাসীর।...জানিস তো? আমার সেজকাকার মেয়ে? অবিশ্যি—নেহাৎ ছেলেবেলায় দেখেছিস্, হয়তো মনে না থাকতে পারে। ষোলো-সতেরো বছর মাদ্রাজে আছে। খুব বড় লোক।

—তা, তিনি হঠাৎ চিঠি দিলেন কেন? আর তাঁর সঙ্গে ভগবানের মুখেরই-বা কি সম্পর্ক?

সুহাসিনী জোরে হেসে বলেন—শোনো কথা ছেলের—! তা, ভগবান তো—মানুষের ভেতর থেকেই কাজ করেন, বাবা! রমা চিঠি দিয়েছে—এই কলকাতা থেকেই। এই যে, লিখেছে—"বহুকাল পরে দেশে ফিরেছি, সকলকে দেখতে ইচ্ছে করে। 'ইনি' কলকাতায় এসেছেন—এঁদের অফিসের একটা ব্রাঞ্চ খুলতে।...ভীষণ ব্যস্ত। আমার তো যাবার সুবিধে নেই, তুমি যদি আসতে পারো তো দেখা হয়। আর একটা কথা জানাই—তোমার ছেলেরা কে কত বড় হলো আমার তো ভাই মনে নেই উপযুক্ত হয়েছে নাকি কেউ? এঁদের অফিসে অনেক লোক নেওয়া হচ্ছে ছোট-বড়-মাঝারি নানা রকমের চাকরি খালি আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে আপনার লোক-'টোক' পেয়ে যাক্ কিছু। মেজদার ছেলেকে তো ঢুকিয়ে নিয়েছেন।...অবিশ্যি ক'রে শীগ্‌গির এসো একদিন, আর এক সপ্তাহ মোটে থাকতে পাবো।"

চিঠি থেকে এতটুকু অংশ শুনিয়ে সুহাসিনী বলেন—ছেলেবেলা থেকে ভীষণ ভালবাসতো আমাকে, 'হাসিদি' বলতে অজ্ঞান ছিল। তুই গেলে—তোর মেসোকে ব'লে নিশ্চয় একটা ভাল চাকরি করিয়ে দেবে। আমি বলি কি, কালই যা! ঠিকানা দেখে নে—

—আরে, তুমি যাবে না?

—আমি? সুহাসিনী ম্রিয়মাণভাবে বলেন—আমি আর কোন্ মুখে যাবো? আমার এই অবস্থার কথা সে জানেই না। এই তো শেষকালে লিখেছে—"তুমি ও জামাইবাবু আমার প্রণাম নিও—!" আমি যাবো না, তুই-ই যা কালকে দুর্গা নাম স্মরণ ক'রে। নিশ্চয় একটা-কিছু হবে। মেজদার ছেলে তো ম্যাট্রিক ফেল? তারই হ'লো, আর তুই তো দু'দুটো পাশ করেছিস!

দু'দুটো পাশ যে কোনোদিন করেছিল, কোনোদিন যে তার ছাত্রজীবন ছিল

শোনো শোনো গল্প শোনো

এ-কথা ভুলেই গিয়েছিল বিশু। মা'র কথায় হঠাৎ যেন মনের মধ্যে একটা আনন্দের বাতাস বয়ে গেল।

সত্যিই তো—সে দু'দুটো পাশ।

তার ওপর আবার মেসোর নিজের অফিস।.....

সুহাসিনীর ভাষায়—সত্যিই এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন ভগবান।

অনেকদিন পরে—বাড়ীতে আবার খুশীর হাওয়া বয়।

সুহাসিনী ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে আজকে আর গালাগাল দিয়ে ডাকেন না, 'বাবা' 'বাছা' করেন। বিশুর সঙ্গে হেসে-হেসে গল্প করতে থাকেন নিজের ছেলে-বেলার।...সেজকাকা ছিলেন কি ভীষণ রাগী, আর ওই রমা কি-রকম চালাকি করে তাঁর বকুনি এড়াতো.....কবে সুহাসিনীকে কি সংকট থেকে উদ্ধার করেছিল..... এই সব।

আজ ছেলেদের জলখাবারের রুটিতে একটু ঘী মাখিয়ে দিলেন সুহাসিনী, দিলেন—ঝিঙের চচ্চড়ির সঙ্গে উপরি দুখানা ক'রে আলুভাজা।...বৃষ্টি পড়ছে ব'লে অসময়ে বাড়তি আর এক পেয়ালা চা জুটলো বিশুর কপালে।...

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা ভালো হয়ে গেছে।

যেন সমস্ত ভাবনা ঘুচে গেছে—সুহাসিনীর আর বিশুর।...

মোটামাইনের চাকরি একটা পেয়েই গেছে-বা বিশু!...তা এক-রকম পাওয়াই বৈকি। রমার বর, বিশুর নিজের মেসো হলো অফিসের কর্ত্তা! আর বিশু হচ্ছে সুহাসিনীর ছেলে।...যে সুহাসিনীকে 'হাসিদি' বলে অজ্ঞান হতো রমা।

পরদিন। অনেক ঠাকুর দেবতার নাম করে পকেটে দুর্গা নাম লেখা বিল্বপত্র দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন সুহাসিনী।...নিজের হাতে ইস্ত্রীটা গরম ক'রে দিলেন রান্নার কড়া নামিয়ে। বললেন—আসছে মাসে একজোড়া জুতো তোর না কিনলেই নয় বিশু, একটা ভদ্রসমাজে যাওয়া—তাছাড়া, হ্যাংলার মতন সেজে গেলে রমার বরের মর্য্যাদাহানি। সবাই তো জানবে 'সাহেবের' আত্মীয়?

বিশু বলে—জুতো? ওসব কথা বাদ দাও। সব-আগে—তোমার কাপড় দু'চার জোড়া এক সঙ্গে। তোমার ও তসর-শাড়ীটা ফেলে দেবো আমি।

অন্যদিন হ'লে সাহস ক'রে কাপড়ের কথা তুলতো না বিশু, কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আজ নিশ্চয়ই সুহাসিনী কাপড়ের কথায় সংসারের অভাব আর বিশুর অক্ষমতার কথা তুলে ধিক্কার দেবেন না। আজ সুহাসিনী বিশুর কথায় হেসে বলেন—তা নয়? আমার কাপড়ের জন্যে বড্ডো ক্ষেতি হচ্ছে কি না? মেয়ে-মানুষ, বাড়ীর মধ্যে থাকি—কাপড়ের তাড়াতাড়ি কি আছে? তোকে পথে বেরোতে হয়—তোর দরকার আগে।

যেন এতদিন পথে বেরোতো না বিশু।

ঠিকানা দেখে—খুঁজে-খুঁজে মাসীর বাড়ীটা বার করে ফ্যালে বিশু।

বাপ্‌স্‌!

কী বড়? কি-রকম সৌখীন?...ঢুকতে সাহস হয় না যেন। ভাগ্যিস সার্ট-প্যাণ্ট দুটো আজকেই ভালো করে ফর্সা আর ইস্ত্রী করা হয়েছে।

পরিচয় পেতেই রমা-মাসী একেবারে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন।—আরে? এত বড় হয়েছো তুমি? এ তো দিব্যি 'কাম্‌লায়েক' ছেলে।

খুব হাসিখুশী মেয়ে রমা-মাসী।

নিজের ছেলে-মেয়েদের ডেকে ডেকে চিনিয়ে দিলেন—এই দ্যাখ্‌ সেই তোদের 'হাসি-মাসীমা'র ছেলে! দাদা হয় তোদের।

দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে আদর ক'রে—সাটিনের গদি-আঁটা সোফায় বসালেন। খুব গল্প করতে লাগলেন।

রমা-মাসীর ব্যবহারে অনেকদিন পরে নিজেকে 'মানুষ' ব'লে মনে হয় বিশুর।...

সাটিনের গদিতে ব'সে ভালো-ভালো খাবার-ভর্ত্তি রেকাবিখানা হাতে ক'রে নিজেকে আর এদের থেকে তফাৎ মনে হয় না—এই রমা-মাসী—শিশির-মেসো, আর

তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।...সত্যিই তো, তফাৎ কিসের? তফাতের কি আছে? বরং রমা-মাসীর ছেলেদের চেয়ে অনেক সুশ্রী সে।

মাসীর ঘরের আলমারিতে-আঁটা মানুষ-সমান লম্বা আয়নাটায় নিজের আপাদ-মস্তক এত ভালো করে দেখতে পায় বলেই হয়তো এদের সঙ্গে নিজের তফাৎ খুঁজে পায় না।

কে বলবে বিশু একটি ভবিষ্যযুক্ত পদস্থ ভদ্রলোক নয়?

ওর নিজের চেহারাটা যে এমন ভালো এটা তো কোনোদিন খেয়াল করেনি।

দুটো সিঙাড়া তুলে নিয়েই মিষ্টি-সুদ্ধু রেকাবিটা সরিয়ে রাখে বিশু।... ছানার জিলিপি, ক্ষীরমোহন আর কড়াপাকের সন্দেশ সুদ্ধু রেকাবিটা।

রমা-মাসী অবাক হয়ে বলেন—ওকি বিশু, ওকি খাওয়া হলো?

বিশু হাসে...আপনি যে একেবারে যত ইচ্ছে দিয়েছেন মাসীমা। আমাকে একটি রাক্ষস-খোক্কস কিছু ভেবেছেন না কি?

—সে আবার কি? রমা-মাসী ব'কে ওঠেন—ছেলেমানুষ তোমরা, এই তো খাবার বয়েস। এই সামান্য দুটো খাবার খেতে পারো না? ওসব শুনবো না। সব খেতে হবে। নাও, সরিয়ে নাও।

বিশু আলগা ক'রে দু'আঙুলে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে বলে—মিষ্টি জিনিসটা আমি মোটেই খেতে পারি না মাসীমা, ওইজন্যে কম বকুনি খাই মা'র কাছে? অথচ আমার কাছে...ওটা একেবারে অসহ্য।

মিষ্টি অসহ্য! সত্যি! সহ্য হবার সুযোগই-বা হলো কবে বিশুর!

কতকাল চোখেই দ্যাখেনি এ সব।

তবু রেকাবির ওপর থেকে চোখটা সহজেই ফিরিয়ে নিতে পারে।

না খেয়ে ফিরিয়ে দিতে পারার মধ্যে যে তীব্র সুখের স্বাদ আছে, খাওয়ার সুখের সঙ্গে তার তুলনা হয় নাকি?

এরপর শিশির-মেসো আসেন।

বিশুর—সিল্কের কুশনে কনুই-ঠেসিয়ে এলিয়ে বসার ভঙ্গী, আর সরিয়ে-

রাখা খাবারের রেকাবির দিকে তাকিয়ে কি না কে জানে, খুব খোসমেজাজে আলাপ জুড়ে দেন।...দেশের কথা, রাজনীতির কথা, মাদ্রাজের সঙ্গে বাঙলাদেশের রীতি-নীতির কোনখানে কি তফাৎ এইসব কথা!—অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন বিশুর বাবার মৃত্যু সংবাদে; সস্নেহে জিগ্যেস করেন—কতদূর পড়াশুনো করেছে বিশু, কি করছে আজকাল?

মিষ্টি জিনিসটা আমি মোটেই খেতে পারি না মাসীমা...[পৃঃ ১১০

বুকটা ধক্-ধক্ ক'রে উঠে বিশুর।

এই তো—দিব্যি সুযোগ! এই কথার পিঠেই তো ব'লে ফেলা যায়—'করছি আর কই মেসোমশাই? স্রেফ্ বেকার ব'সে আছি। আপনি তো—নূতন অফিস-টফিস খুলছেন? দিন না একটা-কিছু!'

কিন্তু কই?

সে-কথা মুখ দিয়ে বেরোলো কই?...ও-সব কি বলছে বিশু?

বিশুর মুখ থেকে আর কেউ বলছে নাকি?...

—পড়াশুনো আর হলো কই মেসোমশাই? বি. এ.-টা দেবার আগেই বাবা মারা গেলেন, বাধ্য হয়ে একটা কাজে ঢুকে পড়তে হলো।

—ও, তাই বুঝি?.....রমা-মাসী উৎসুক প্রশ্ন করেন—তা, কি রকম কাজ? কত মাইনে?

বিশু যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—কাজ আর কি? বাঙালীর ছেলের যা কাজ? কেরাণীগিরি!.....এখন অবশ্য মাত্র শ'দুই পাচ্ছি, তবে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

আচ্ছা, বিশু কি বলছে—বুঝতে পারছে তো নিজে?

কেন বলছে এমন মানেহীন কথা? শুধু বলার সুখ? যা-খুশী বলতে পারার?

রমা-মাসী খুশী হয়ে বলেন—তা বেশ, বেশ। আর বেশী পাশ করেই-বা কি হাত-পা বেরোবে?...সতু, দ্যাখ! তুই এখনো এত খোকা, আর তোর থেকে মাত্র তিন বছরের বড় তোদের বিশুদা—কী রকম কাজের ছেলে।...এখুনি এমন ভালো চাকরি করছে!

শিশির-মেসো বলেন—হ্যাঁ, আমি দেখেই বুঝেছিলাম খুব বুদ্ধিমান ছেলে! দেখে ভারী খুশী হলাম বাবা! উঠছো? আচ্ছা—আমরা থাকতে-থাকতে পারো তো এসো আর-একদিন।

—দেখি, রবিবার না হ'লে তো হচ্ছে না?...ব'লে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বিশু মাসী-মেসোকে।

সাতটা মোটে পয়সা আছে পকেটে। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসেও সবটা কুলোবে না।...বেশ খানিকটা হেঁটে তবে ট্রাম ধরলে হতে পারে।...জোর জোর পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করে বিশু...কিন্তু পা-টা কিছুতেই এগোচ্ছে না যে। মনে হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে বুঝি! না কি—মনের ইচ্ছেটা পিছন থেকে ঠেলছে তাকে?

ঠেলছে মাসীর বাড়ীর দিকে?

কি করবে বিশু? ফিরে যাবে আবার? বলবে—'তখন ঠাট্টা ক'রে কতকগুলো বাজে কথা ব'লে গেছি মাসীমা, মেসোমশাইকে ব'লে-কয়ে যেমন-তেমন চাকরি একটা পাইয়ে দিন আমায়। অনেক আশা নিয়ে এসেছি?'...আর...আর ...সরিয়ে-রাখা সেই রেকাবিটা টেনে নেবে আবার? কি বলবে? 'আপনার নিজের হাতের তৈরি ছানার জিলিপি—অত ক'রে বললেন আপনি—বেরিয়ে গিয়ে মন কেমন করতে লাগলো?'

অসম্ভব।

হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে, ফিরিয়ে আনা যায় না।

কিন্তু ঢিলটা ছুঁড়লো কেন বিশু?

ভুলে-ভুলে সমস্ত রাস্তাটাই সে হাঁটতে থাকে, আর অনবরত ভেবে চলে—অমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথাগুলো কেন বললো সে?

সে কি পাগল হয়ে গিয়েছিল?

তাকে কি ভূতে পেয়েছিল? সেই সর্ব্বনেশে ভূত, জোর ক'রে তার গলাটা টিপে ধরে এই রকম উল্টোপাল্টা কথা বলিয়ে নিয়েছে? নিজের কাজ নিজের কাছে এমন দুর্ব্বোধ্য আর কখনো হয়েছে কারুর?

এখন আর নিজের মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফেললেও কিছু উপায় হবে না। উপায় হবে না—গ্যাসপোষ্টে মাথা ঠুকলে।

কী বলবে সে সুহাসিনীকে?

বিশু বাড়ী ফিরলেই হরির লুট দেবেন ব'লে যে পাঁচ আনার বাতাসা আনিয়ে রেখেছেন তিনি!

বর্ণচোরা

আমাদের পুরনো চাকর নারাণের সাধুভাষার ওপর ছিল ভারী ঝোঁক। ভাত-কাপড়কে তুচ্ছ ভাবে 'ভাত-কাপড়' বলতে প্রাণ চাইতো না তার। বলতো—'অন্ন-বস্তর'। জুতোকে বলতো 'পাদুকা' বিছানাকে বলতো 'শয্যে'। ছোট ছেলেদের ভুলেও কখনো 'বালক' ছাড়া ছেলেপুলে বলতো না। আর বুড়োমানুষেরা ছিল তার কাছে 'বৈর্দ্ধবৈক্তি'।

মুখে মুখে তার জোগাতোও বেশ মজার মজার কথা।

নিজে সে 'বৈর্দ্ধ' হয়ে অনেকদিন দেশে চলে গেছে, কিন্তু তার কথাগুলো বাড়ী থেকে চলে যায়নি! ঠাট্টা-তামাসার সময় সবাই নারাণের কথা ব্যবহার করে যখন তখন।

একটা মজার কথা সে প্রায় বলতো। বলতো—বালক জাত বড়ো সর্ব্বনেশে জাত বাবু, ওনাদের কখনো 'অবোধ' বলে অগেরাহ্যি করবেন না। ওনাদের পেটে পেটে যা বুদ্ধি, তাতে আপনাদের এক হাটে বেচে আর-এক হাটে কিনে আনতে পারে। ওনারা হচ্ছেন বর্ণচোরা আম!

হঠাৎ একদিন নারাণের সেই অভিমতটি খাঁটি বলে প্রমাণ করে বসলো আমাদের বাড়ীর বালকেরা...আমাদের নিশু বাসু নাটু শাঁটু কানু ভানু রানু টুনুর দল।

শোনো শোনো গল্প শোনো

বাড়ীর তিন কর্ত্তার শেষ বয়সের আটটি ছেলেমেয়ে।

ছয় থেকে তেরো-চোদ্দের মধ্যে বয়স সব ক'টির। গুণের দিক থেকে প্রত্যেকেই এক একটি চারপেয়ে লক্ষ্মী! চৌধুরী-বাড়ীর ঘরবাড়ী সব কিছু তচ্‌নচ্‌ করবার জন্যই যেন বিধাতা পুরুষ এ-ক'টিকে নির্জ্জনে বসে গড়েছেন!

লাফানো-ঝাপানো, ফেলাছড়া, জিনিষপত্র ভাঙ্গাচোরা, খেতে নাইতে হুলুস্থুল বাধানো, এবং এ সবের সুবিধা না হলেই পাড়া জানিয়ে চীৎকার করা ছাড়া এদের দিয়ে যে আর কিছু হওয়া সম্ভব, সে কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি কোনোদিন!

'ওদের কিচ্ছু হবে না'—এই হচ্ছে ওপরওলাদের অভিমত। এদের ওপর আরোপ করতে বেশ কতকগুলি ভালো ভালো বিশেষণ আবিষ্কার করেছেন কর্ত্তারা। যথা—'আস্তভূত' 'গেছো বাঁদর' 'পাহাড়ে শয়তান' 'রঘু ডাকাত' 'মেয়ে গুণ্ডা' 'মন্দা ভগবতী' ইত্যাদি।

হঠাৎ একদিন তাক লাগিয়ে দিলে 'গেছো বাঁদর' শাঁটু চন্দর। যে শাঁটুর কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, আছাড় খাওয়া আর হাত-পা ভাঙ্গার বহর দেখলে মনে হয় এখনো বুঝি তিন বছর বয়স পার হয়নি ওর!

শোনা গেল—সেই শাঁটু নাকি বই লিখছে!
এও শোনা গেল যে-সে বই নয়, নাটক!
নাটকও যেমন-তেমন নয়, যার নাম হচ্ছে—"হায় রে সংসার!"
সে নাটক অভিনয় করবেন বাকি সব গুণধরেরা।
শুনে তো ওপরওলারা অবাক!
ওদের ভিতর এত! 'বর্ণচোরা আম' আর কাকে বলে!

বড় কর্ত্তা চোখ কপালে তুলে বলেন—অ্যাঁ, কি বললি? শেঁটো নাটক লিখছে? সেই নাটক আবার প্লে করবি তোরা? কিসের পালা লিখেছে? কীচক বধ? তাড়কা নিধন? না কি বকরাক্ষসের বোকামি?

শোনো শোনো গল্প শোনো

নাটু ছোট ভাইয়ের হয়ে সবিনয়ে জানায়—ও সব সেকেলে টেকেলে কিছু নয় জ্যাঠামশাই, নাটকের নাম হচ্ছে—'হায় রে সংসার'!

"কি হলো কথাটা?...সাধারণ বাঙালী না, কি বললি?"

—অ্যাঁ! কি বললি? শুনি আর একবার! 'হায় সংসার'?

—'হায়' নয় জ্যাঠামশাই, 'হায় রে'।

—আরে রেখে দে তোর —রে! বলি, শেঁটো লিখেছে তো ও বই? আছে কি ওতে?

রানু তাড়াতাড়ি অবহিত করিয়ে দেয়—ওতে আর হাতী-ঘোড়া কি থাকবে জ্যাঠামশাই! বইটা হচ্ছে সাধারণ বাঙালী জীবনের একখানি নিখুঁৎ চিত্র!

জ্যাঠামশাই যেন হঠাৎ কানে গাঁট্টা খান!

চুল নেই, তেল-চক চকে টাক, তবু নিজের চুল নিজে মুঠো করে ধরবার ভঙ্গীতে ধরে 'হুমো মতো' মুখ করে বললেন—কি হলো কথাটা? বল্‌তো আর একবার! সাধারণ বাঙালী, না, কি বললি? মনে হচ্ছে—কোথায় যেন শুনেছি কথাটা!

শোনো শোনো গল্প শোনো

রানু বলে—বাষট্টী বছর ধরে তো বাঙলা ভাষা শুনে আসছেন জ্যাঠামশাই, এই সামান্য কথাটুকু শুনেছেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

জ্যাঠামশাই যেন কিছু কৌতূহলাক্রান্ত! খানিকক্ষণ ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলেন—তা' কে কে সাজবি?

—কে নয়? রানু মুখস্থ করা পার্টের মতো গড়গড় করে বলে যায়—নতুনদা সাজবে জমিদার, রাঙাদা নিজে ডাক্তার, ছোড়দা গরীব কেরাণী, বাসু জমিদারের গোপালভাঁড়, কানু কবি, ভানু হচ্ছে শয়তান কালোবাজারী, টুনু হচ্ছে একটি স্নেহময়ী মা, আমি স্কুলের হেড্ মিষ্ট্রেস, পাশের বাড়ীর গদাকে হাতে-পায়ে ধরে চাকর সাজতে রাজী করানো হয়েছে।

—বলিস কি? ক্রমশঃই তাজ্জব বনে যান জ্যাঠামশাই। আর শোনার ধৈর্য্য থাকে না—অবাক হয়ে বলে ওঠেন—এই এত সব আছে তোদের বইতে? স্টেজ হবে কোথায়?

—কেন, নীচেকার হলে! বইয়ের আলমারিগুলো সরিয়ে ফেলা হবে। সে আপনি দেখবেন তখন জ্যাঠামশাই, ঘর চিনতে পারবেন না। ডেকরেটর আসবে, ইলেকট্রিক ফিট্ করা হবে, সাজটাজ আসবে ভাড়া হয়ে! সবই তো তার কমপ্লীট্! শুধু মুস্কিল হয়েছে দুটো পার্ট নিয়ে!

রানুর গলার স্বর করুণ হয়ে আসে; সে বলে, বাউল ভিখিরি সাজতে কেউ রাজী হচ্ছে না। আর, একটা দজ্জাল পিসি জোগাড় হচ্ছে না কিছুতেই। মেয়েই নেই আর!

—তা ওই দজ্জালের পার্ট তুই নিলেই পারতিস? ঠিক হতো!

—আমি যে অল্‌রেডি স্কুলের বড় দিদিমণি সাজছি! রানুর স্বর করুণতর—পিসি যদি নিতে একটু রাজী হতেন—ওঁকে আর কষ্ট করে পার্ট মুখস্থ করতে হতো না! নিজের স্বভাবেই—

ভাঁড়ার ঘর থেকে একগাছা সজনে ডাঁটা হাতে করেই পিসি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে ছুটে আসেন—কি বললি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে? যা নয় তাই কথা!! আমি করবো তোদের সঙ্গে 'পেলে'? এ্যাঁ!

শোনো শোনো গল্প শোনো

রানু তাড়াতাড়ি জ্যাঠার আড়ালে সরে গিয়ে কাতর অনুনয়ে বলে--দোষ কি পিসি? এ তো সখের থিয়েটার! তা'ছাড়া কষ্ট করে রিহার্শাল দিতে হবে না তোমাকে!

"কি বললি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে... [পৃঃ—১১৭

ওদিক থেকে টুনু টুক্ করে বলে—শুধু খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাঁকা না দিলেই হলো। অন্য বাড়ীর ছেলেরা ভাইপো সাজবে কিনা!

—রোজ তোদের খুন্তি ছ্যাঁকা দিই, না? বলে পিসি রাগে খট্ খট্ করে চলে যান।

খট্ খট্ করে কেন? পিসির পায়ে খড়ম!

খড়ম কেন?

পায়ে কাঁচ ফোটার ভয়ে। বছর দশেক আগে একবার পায়ে বোতল-ভাঙ্গা ফুটে পিসিকে শেষ অবধি হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। সেই ইস্তক পিসি খড়ম ভিন্ন এক পা হাঁটেন না। দুবেলা খড়ম ধোন, রান্না পর্য্যন্ত চালান ঐ খড়ম পরে!

জ্যাঠামশাইকে বাগে পেয়ে রানু টুনু ইত্যবসরে গুছিয়ে চাঁদার কথা তুলেছে, কিন্তু কে জানে, পিসি আবার হঠাৎ বেরিয়ে আসবেন খট্খটিয়ে!

তাচ্ছিল্যের সুরে পিসি বলেন—আমি তোদের থিয়েটারে রঙ্ মেখে সঙ্ সাজবো! শোনো কথা!

টুনু ব্যস্ত হয়ে বলে—ওমা, সে কি? ওসব কিছু করতে হবে না তোমাকে! যেমন আছো—

ফিক করে একটু হেসে পিসি বলেন—একটা পরচুলও তো পরতে হবে! এই ন্যাড়া বুড়িকে নিয়ে করবি কি তোরা?

রানু সোৎসাহে বলে—তাই তো দরকার গো! কেউ ন্যাড়া হতে চাইছে না বলেই তো হয়েছে মুস্কিল!

পিসি আবার চলে যান খট্‌খটিয়ে।

যাই হোক, এ'দের ব্যাপার তো মিটলো। খবরটা মেজকর্ত্তার কানে যেতে, সর্ব্বনাশ! মারমুখী হয়ে আসেন তিনি ছুটে!

গগন বিদীর্ণ করে বলেন—কি বললি? থিয়েটার? শেঁটো লিখেছে ড্রামা, তোমরা করছো প্লে? এ্যাঁ! হলো কি বাড়ীতে? রোসো করাচ্ছি থিয়েটার। একধার থেকে শায়েস্তা করছি সবাইকে! বড্ডো ফাজিল হয়েছো দেখছি! এ সব শিখলে কবে? এখনো দু'বেলা ভাত খেতে বসে শেঁটো ওর মার কাছে পিটনচণ্ডী খায় না? এ যে দেখি 'ডুডও চলে, টামাকও চলে'। থিয়েটার করবে! পিঠের ছাল তুলবো না। একধার থেকে পিঠের ছাল তুলবো। পাইকিরি হিসেবে চাবুক লাগাবো সক্কলকে—হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করে ছাড়বো!

রাগে যেন তুড়িলাফ খেতে থাকেন মেজকর্ত্তা!

তা রাগ তিনি করতেই পারেন!

চিরকাল থিয়েটার, বায়োস্কোপ, যাত্রা-গান, রেডিও, গ্রামোফোন—সব কিছু তাঁর দু'চক্ষের বিষ! ওদের পথ দিয়ে হাঁটেন না, ও সবের ছায়া মাড়ান না!

মেজকর্ত্তা বাড়ী থাকলে রেডিওর চাবি খোলা হয় না সাহস করে। ওঁর বড় বড় গোঁফজোড়া আর রাশভারি চেহারা দেখলে সকলেই নিজের ওপর রাশ টানে।

মজা করেন ছোটকর্ত্তা।

ওদের চুপি চুপি আড়ালে ডেকে মোটা চাঁদা দেন, আর খাবার দালানে বসে জোর গলায় বলেন—খবর্দ্দার বলছি ওসব মতলব ছেড়ে দাও তোমরা! মেজদা তাহ'লে আস্ত রাখবেন না। তোর বাবাকে চিনিস তো রাণী!

চেনে বৈ কি!

না আবার!

যারা 'হায় রে সংসার' লিখেছে, কাউকে চিনতে তারা বাকি রেখেছে না কি?

তা বললে কি হবে ওদের এখন নতুন উৎসাহ, নবীন আশা। জ্যাঠা-খুড়োর ভয়? সমুদ্রে বালির বাঁধ!

দু'-একদিন লুকোচুরি চলে, তার পর বাঁধ-ভাঙ্গা নদী।

সারাদিনই বাড়ীতে অভিনয়ের হাওয়া বইছে!

যখনি যে ছেলে-মেয়েটিকে দেখো, আর্শির সামনে আছে। শুধু আছে? হাত-পা নাড়ছে, মুখভঙ্গী করছে, ঘুষি পাকিয়ে লেকচার দিচ্ছে। কি না করছে!

এ ছাড়া চাঁদার খাতা নিয়ে তাড়া করা, হ্যাণ্ডবিল লিখে বিলি করা—এ-সব চলছে ফাঁকে-ফাঁকে। পাড়ার ছেলেদের বাড়ী থেকেও চাঁদা নেওয়া হচ্ছে! জ্যাঠা-মশাইকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে মোটা কিছু আদায় করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, পিসিও নাকি সিকে পাঁচেকের আশ্বাস দিয়েছেন!

শুধু তাই নয়—পার্ট নিতেও নাকি নিমরাজী হয়েছেন তিনি। তবে ন্যাড়া মাথাই রাখবেন, না, পরচুলে ঢাকবেন সেটা অসাব্যস্ত আছে! এদের ইচ্ছা, ন্যাড়াই থাকে—পিসির মাথায় চুল.....সেটা যেন বেমানান! পিসি বলছেন, জগৎ সুদ্ধু পিসিরই মাথা ন্যাড়া, এমন কিছু প্রমাণ আছে?

শোনো শোনো গল্প শোনো

শুধু মেজকর্ত্তাই অনমনীয়।

তোড়জোড়ের ছন্দাংশ দেখলেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছেন! আর একধার থেকে সবাইকে 'ন ভূত, ন ভবিষ্যতি' করছেন!

পিসির পার্ট নেওয়ার খবরে তিনি জলে পড়েন কি, আগুনে পড়েন!

ডাক দেন—বিন্দি বিন্দি, এই হাড়গিলে চামচিকে, ধিঙ্গি অবতার! তুই নাকি ওদের সঙ্গে এ্যাকটো করবি?

বিন্দি বা বিন্দুবাসিনী লজ্জা-লজ্জা মুখে বলেন—কি করি মেজদা, ওরা সব বড্ড ধরেছে, ছাড়ছে না! আহা কত আশা করে বইটা লিখেছে! বাড়ীতে এমন জলজ্যান্ত আস্ত পিসি থাকতে একটা পিসির অভাবে বইটা মাটি হবে?

—ওদের অভাব কিসের? নিজেরা করে না কেন?

একটু নরম সুর ধরেন মেজকর্ত্তা।

বিন্দুবাসিনী বলেন—ওই তো হয়েছে মুস্কিল! পাড়ার মেয়েগুলোকে বলেছিল, সবাই ভালো ভালো শাড়ী-গয়না পরতে চায়, থান কেউ পরবে না! আমি তো কেবল মাত্তর মায়ায় পড়ে—আবার দেখো না, কি এক বাউল-মাউল নিয়ে পড়েছে ভাবনায়! ছেলেগুলোও সব সার্ট কোট বুট প্যাণ্ট পরে গ্যাড্‌ম্যাড্‌ কথা কইবে, কেউ আলখেল্লা পরে ওটা করতে রাজী নয়।

মেজকর্ত্তা হঠাৎ বীরবিক্রমে হাঁক দেন—শেঁটো, শেঁটো, এই গেছো বাঁদর—শোন দিকি!

শাঁটু ছুটে আসে—কি বলছেন?

—বলি, এমন বই লিখিস কেন হতভাগা, যে এ্যাকটো করবার লোক জোটে না?

শাঁটু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে—আগে কি করে জানবো মেজজ্যাঠামশাই? সংসারের গপ্‌প, সংসারের মতন লিখবো তো! এমন জানলে আগা-পাশ্‌তলা রাজারাণীতে ভর্ত্তি বই লিখে ছেড়ে দিতাম। রানু বোকাটা ইস্কুলের বড় দিদিমণি

সাজবে, তবু ফুলের মটুক চাই ওর। বলে কি না—জন্মে কখনো ফুলের মটুক পরলাম না রাঙাদা, একদিন থিয়েটার করবো—তাও পরতে দিবি না?...নে, পর তবে! প্রাণভরে ফুলের মটুক, ফুলের মালা! আমার কি? টুনি 'কোট' ধরে বসে আছে সেজদির বিয়ের লাল বেনারসীটা পরে 'মা' সাজবে। আমার এখন হাত-পা আছড়াতে ইচ্ছা করছে।...বাউলটাকে তো বাদই দিয়ে দিলাম।

মেজকর্ত্তা ভুরু কুঁচকে বলেন—বাদ? বাউল বাদ দিলে নাটকের রইলো কি?

মেজজ্যাঠার কাছ থেকে এহেন সহানুভূতি! এ যে স্বপ্নাতীত!

আর কিছু নয়। তুলসী-তলায় হরির লুট মানার ফল এটি! মেজজ্যাঠার সুমতির জন্য মা কালীর কাছে নগদ পাঁচ পয়সা আর তুলসী-তলায় হরির লুট মেনেছিল শাঁটু। সে হচ্ছে দলপতি। তারই তো যত ভাবনা।

ভাবলো, সুবর্ণ সুযোগ!

এই 'মওকায়' কিছু চাঁদা বাগাবার তাল করা যাক। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র এঁকেই ঘায়েল করা যায়নি। মানে, সাহস হয়নি!

মুখের ভাব যতটা সম্ভব করুণ করে সে বলে—কপাল আমার মেজজ্যাঠামশাই! নইলে! চাঁদাই বা ক-টাকা উঠলো?

আহা! ভাইপোর করুণ মুখ জ্যাঠাকে ভারী বিচলিত করলো। না হলে তিনি খামোকা খপ্ করে নগদ পাঁচটাকা চাঁদা কবুল করে বসেন!

দু'পাটি দন্ত বিকশিত করে শাঁটু ছোটে সমাজে সুখবর দিতে! আর ভাবে—তাইতো, লোকটাকে যত নির্ম্মায়িক ভাবতাম, তেমন নয়, দেখছি। "হায় রে সংসার"-এ জ্যাঠার চরিত্রটা রাক্ষুসে না করলেই হতো!

চাঁদা দেবার সময় মেজকর্ত্তা আবার দয়া-পরবশ হয়ে প্রশ্ন করেন—কি রে তোদের বাউল জোগাড় হলো?

এবারে সকলে সদলবলে এসেছিল। একযোগে সবাই 'না না' করে ওঠে। ও পার্টটা আমরা ফেলে দেবো। কি দরকার? কেউ যখন—

মেজকর্ত্তা চোখ পাকিয়ে বলেন—ফেলে দিবি? জলজ্যান্ত একটা মানুষকে

ফেলে দিবি মানে? এ কি ছেঁড়া কাগজ নাকি? ফেলে দিলেই হলো? যেমন করে পারো, জোগাড় করো গে—বাউল চাইই চাই।

—আচ্ছা আচ্ছা, ইয়ে—ফেলবে তার—সময়ই বা কোথা! বলতে বলতে সব ক'টা সরে পড়ে। হঠাৎ বাউলের ওপর এত দরদ কেন মেজকর্ত্তার, সেইটাই বুঝে উঠতে পারে না।

সেদিন না-পারলেও পারে কিন্তু দু'-দিন পরে।

সন্ধ্যাবেলা তিনতলার ছাদে ঘটা করে চলছে ড্রেস-রিহার্শাল। পাড়ার অভিনেতারাও সব হাজির। অনুপস্থিত শুধু টুনি। তাকে ডাকাডাকি চলছে। অবশ্য পিসিও বাদ আছেন। তাঁর তো রিহার্শাল নেই। যা করবেন, স্বভাবে!

গদা বলে—যাক্, পিসি তাহলে রাজী হলেন?

নাটু বলে—তাই তো দেখছি। মুখে যতটা গর্জ্জন, ততটা—

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ সিঁড়িতে দুম্ দুম্ শব্দ!

টুনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে, রক্তমূর্ত্তি চেহারা! হাসছে, না কাঁদছে, বোঝা দায়।

—কি রে টুনি, কি হলো? হাঁপাচ্ছিস কেন অত? আরে মোলো, বল্ না ছাই!

টুনি কোনো প্রকারে নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—মেজজ্যাঠা!

ডাম্বেলটাকে একতারা করে বাউল-নাচের রিহার্শাল দিচ্ছেন! [পৃঃ—১২৪

শোনো শোনো গল্প শোনো

—মেজজ্যাঠা!...কি বলছেন? অ্যাঁ—অ্যাঁ—চাবুক-টাবুক আনছেন নাকি? ওরে শেঁটো, কি হবে? ও গদা, সিঁড়ির দোরটা চেপে ধর না রে—

টুনু অনেক কষ্টে বলে—চাবুক নয়, নাচ!

—নাচ!

—হ্যাঁ রে ছোড়দা, মেজজ্যাঠা নাচছেন।

—মেজজ্যাঠা নাচছেন!

—ওরে বাবা রে! রাগের চোটে নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছেন। ও টুনি কোথায় নাচছেন রে?

টুনি এতক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছে, ফিস ফিস করে বলে—ঘরের মধ্যে—দরজায় খিল দিয়ে—আর্শির সামনে! মালকোঁচা করে ধুতির ওপর মেজজেঠির সেমিজ পরে, বড়দার ডাম্বেলটাকে একতারা করে বাউল-নাচের রিহার্শাল দিচ্ছেন! আমি জানলা দিয়ে—উঃ...আমাকে যেই না দেখেছেন...বাবা রে এখনো আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে!

এরা 'রুদ্ধশ্বাসবক্ষে' না কি যেন বলে, সেইভাবে প্রশ্ন করে—তোকে দেখে কি রে? সেই ডাম্বেল ছুঁড়ে...?

—না রে গদা, তা নয়! আমাকে দেখতে পেয়েই ফিক করে হেসে বললেন—কি গো, একটা বুড়োহাবড়া বাউল হলে চলবে তোমাদের? না চললে আর পাচ্ছই বা কোথায়, কি বলো?

এত কথার মধ্যে কিন্তু চুপচাপ ছিল স্বয়ং নাট্যকার। সেই অবধি—ডাক্তারের সাজ সাজতে সরু ছুঁচলো একজোড়া গোঁফ নিয়ে নাকের নীচে ঠিকমতো সাঁটতে হিমসিম খাচ্ছিল সে!

এইবারে সেই সাঁটা গোঁফের ফাঁকে একটু মুচকি হেসে বলে—এ সন্দেহ আগেই করেছিলাম আমি। বলি—খামোকা বাউলের জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন রে বাবা!...জানি বাবা মুখেই যত তড়পানি, ভেতরে সকলেই এক-একটি দিব্যি ইয়ে—সেই যে 'বর্ণ-চোরা আম' না কি বলে, তাই!

স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে কাল, মনটা যেন আকাশে উড়ছে।

মনে-মনে গান গাইতে-গাইতে বেরোচ্ছি বন্ধুর বাড়ীর উদ্দেশে, পিছন থেকে মা ডাকলেন—ওরে এই শোন্, পিছু ডাকবো না, দাঁড়া—

নিশ্চয় কাজ!

ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম—কি?

—বলছি, আজকে যেন আর বেড়িয়ে ফিরতে দেরী করিস্‌নে। সকাল সকাল আসিস্!

চমকে বললাম—কেন, শিন্নি আছে বুঝি?

দেখেছি কিনা, বাড়ীতে শিন্নি হলেই সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ী ফেরবার কড়া হুকুম জারি হয়ে যায়।

মা গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা, সে কি? শিন্নির কথা আবার কে বলছে তোকে? তখন বললাম না, আজ তোর পানুকাকা আসবে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

'পানুকাকা' আসার খবরটা মা এমন মহিমার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন যেন বাড়ীতে রাজ্যপালই-বা আসবেন। কখন যেন বলেছিলেন একবার, কিন্তু মনে রাখবার মতো কথা নয় ভেবেই ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যি, পানুকাকা আসবেন শুনে দু'বাহু তুলে নৃত্য করবার কি আছে তাও জানি না। আমি তো চিনিই না ভালো ক'রে। সেই কবে কোন্ জন্মে দেখেছি।

প্রায় হাত-পা আছড়ে ব'লে উঠি—পানুকাকার সঙ্গে আমার কি? তোমরাই তো রয়েছো?

মা বললেন—এই দ্যাখো! পানুকাকা যে তোর নাম করতে অজ্ঞান হতো রে। কী ভালোই বাসতো তোকে! চিঠিতেও লিখেছে তোর কথা—"পিলসুজবাবুর খবর কি? আমাকে ভুলে গেছে বোধ হয়? আমার তো তার সেই হাম্মা দেওয়া চেহারাটি পর্য্যন্ত মনে আছে—"

শুনে খুব খুসী হয়ে যাবো এই বোধহয় ধারণা ছিল মা'র, আমার তো মেজাজ খারাপই হয়ে গেল।

আমি যে কোনোকালে হামাগুড়ি দিতাম এ-কথা মরে গেলেও বিশ্বাস হয় না আমার। আর যদিও বা ভগবানের নিয়মে দিয়েও থাকি কোনোকালে, আমার মতে সে হচ্ছে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। সে ব্যাপারের কেউ সাক্ষী ছিল ভাবলেই রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে ওঠে।

অথচ গুরুজন-জাতীয় লোকদের কি ছাই ওই সব গল্পই যত মুখরোচক!

কবে কোন্‌কালে যে আমি সেই আদি-মানবের বেশে পা ছড়িয়ে ব'সে—"আঁমি গ'দা খাবো...আঁমি গ'দা খাবো" ব'লে দুলে দুলে কাঁদতাম, সে-কথা আর ভুলতে চান্ না কেউ। তার প্রমাণই দ্যাখো, এই যে আমি শ্রীপ্রদীপকুমার, ছেলেবেলায় রোগা ছিলাম ব'লে পানুকাকা নাকি স্নেহে গদ্‌গদ হয়ে 'পিলসুজবাবু' নামকরণ করেছিলেন, সেই ডাকটি এখনো ভোলেননি।

সে-সব যাই হোক, মাকে বললাম—আমি তো আর সেই খোকাটি নেই। এসে কি করবো? হামা দেবো?

শোনো শোনো গল্প শোনো

মা ব'কে উঠলেন—সব সময় বাজে বক্ বক্। এসে গল্পটল্প করবি আবার কি!...পানুঠাকুরপো কি সোজা বিদ্বান্? দুটো কথা কইলেও জ্ঞান জন্মাবে।

—আচ্ছা আসবো, জ্ঞান জন্মাবার জন্যেই আসতে হবে—ব'লে আবার যেতে যাচ্ছি, মা বললেন—দাঁড়া, পিছু ডাকবো না, আসবার সময় ভালো ল্যাঙড়া আম আনিস্ গোটা দুই! এ-বাজারে বোধহয় পাবি না, ও-বাজারে দেখিস্, আর দ্বারিকের গোলাপী সন্দেশ চারখানা, ভেজিটেবেল্—

বুঝলাম—নাম না করে পিছু ডাকার উদ্দেশ্যটা কি!

করুণভাবে বললাম—মনে থাকবে না মা, ফর্দ্দ দাও আর টাকা—

বেড়াতে যাওয়া আর হোলো না। ল্যাঙড়া আম আর গোলাপী সন্দেশ ভেজিটেবেল্ চপ আর ক্ষীরের কালোজাম, 'পয়োধি' আর সল্টেড কাজুবাদাম ইত্যাদি পানুকাকার প্রিয় খাদ্যগুলি সংগ্রহ ক'রে গুছিয়ে বাগিয়ে বাড়ী ঢুকলাম, টের পেলাম—পানুকাকা এসে পড়েছেন। কারণ নীচের দালানে একজোড়া অচেনা জুতো।

মা'র কাছে বকুনি খাবার ভয় আছে প্রাণে, গুটি-গুটি ওপরে উঠতেই মা'র ঘর থেকে হাসির আওয়াজ কানে আসে।

অচেনা হাসি!

ভাবলাম—যাক্ বাবা, এই হাসির আবহাওয়ায় ঢুকে পড়ি। দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখলাম—

কি দেখলাম? সে কি কেউ বিশ্বাস করবে?...হয়তো করবে না, তবু যা সত্যি দেখেছি, বলছি। দেখলাম কোট প্যাণ্ট-পরা পানুকাকা ঘরের মাঝখানে দুই হাত কায়দা ক'রে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে! আর সামনে একটা তিন-চার বছরের মেয়ে উড্‌পেন্সিলের মতো সরু-সরু দুটো হাত তুলে, পানুকাকার মতো কায়দা করতে চেষ্টা করছে!

খাটের ওপর মা বিপন্ন মুখে ব'সে।

আমাকে দেখতে পেয়েই মা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন—এই যে, এতক্ষণে আসা হোলো বাবুর! এই দ্যাখো পানু ঠাকুরপো, তোমার পিলসুজবাবু।

পানুকাকা ঘরের মাঝখানে দুই হাত কায়দা ক'রে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে! [পৃঃ ১২৭

—দেখতে পাস না ব্যাটা নবাবপুত্তুর?

শোনো শোনো গল্প শোনো

পানুকাকা একবার মাত্র সোজা হয়ে আমার দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন—ওঃ, খুব যে লম্বা হয়ে গেছিস্ দেখছি! কতো বয়েস হোলো?

মা আরো তাড়াতাড়ি বললেন—এই ষোলয় পড়েছে। এবারে ম্যাট্রিক পাশ করলো ফার্স্টডিভিশান পেয়ে।

'ম্যাট্রিক' কথাটি বলাই চাই মা'র। স্কুল-ফাইন্যাল মুখেও আনবেন না।

ভাবলাম—ফার্স্টডিভিশান শুনে নিশ্চয়ই পানুকাকা একটু প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাবেন। কিন্তু দৃষ্টি কোথায় পানুকাকার? দৃষ্টি সেই হাড়-জির্জিরে মেয়েটির দিকে।

—তাই বুঝি? বেশ, বেশ!...আচ্ছা স্বপ্নারাণী, এইবার তো দাদা এসেছে, দাদাকে একটু নাচ দেখিয়ে দাও দিকি!...এই যে...এই রকম ক'রে—কি যে সেই গান বলে তোর দিদি?...'ছন্দে ছন্দে দুলি' না কি?

ঠিক নেঙ্টি ইঁদুরের কণ্ঠে কিচ্ কিচ্ ক'রে স্বপ্নারাণী ব'লে উঠলেন—"থন্দে থন্দে দুলি আনন্দে আমি বন—পুল গো!"

খেলার মাঠ থেকে শিল্ড নিয়ে বিজয়ীদল যে ভাবে 'হিপ্-হিপ্ হুর্‌রে' ক'রে ওঠে, ঠিক সেই সুরে 'হুর্‌রে' ক'রে উঠে, পানুকাকা বললেন—এই যে! আরে বাঃ বাঃ! দাদাকে দেখে গলা খুলে গেল! গাও, সবটা গাও!...ও কি! চুপ ক'রে থাকে না—ছিঃ! লোকে নিন্দে করবে।...বুঝলেন বৌদি, লজ্জায় ওইরকম করছে, নইলে চমৎকার গায়।

মা বললেন—তা লজ্জা করবে বৈ কি, আমরা তো একেবারেই অচেনা!

বেশ বুঝলাম, আর কোনো গল্পটল্প না ক'রে পানুকাকা শুধু মেয়ের গান শোনানোর তাল করেছেন দেখে মা'র ভাল লাগছে না।

কিন্তু পানুকাকা বোধহয় ভাবছেন, আমরা শোনবার জন্যে হাঁ ক'রে আছি। তাই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন—আরে না-না, লজ্জা-টজ্জা মোটেই নেই খুকুর। আজকেই শুধু কেন জানি না...গাও খুকু, লক্ষ্মী মেয়ে, প্রাইজ পাবে! দাদাকে, জেঠিমাকে গান না শোনালে ভীষণ রাগ করবো!

● ছেলেমানুষ আর কাকে বলে?

অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতি এমন কি—বকুনি পর্য্যন্ত। চলতেই থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে।

আমাদের এদিকে মনে হচ্ছে—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

কিন্তু পানুকাকা না-ছোড়!

মেয়ের গান তিনি আমাদের শোনাবেনই!

মিনিট পনেরো ধস্তাধস্তির পর মেয়েটা হঠাৎ একবার সেই ইঁদুরের মতো গলাতেই কিচ্‌কিচিয়ে গেয়ে উঠলো—

"থন্দে থন্দে দুলি আনন্দে—
আমি বন—পুল গো।
বাথন্তিকার কন্থে আমি
মালিতী দোদুল গো!"

—মার দিয়া কেল্লা! লাফিয়ে উঠলেন পানুকাকা—এইতো লক্ষ্মী মেয়ে!... নাচো সঙ্গে-সঙ্গে? এই যে—এই রকম।

দুই হাত কায়দা ক'রে আবার নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়লেন পানুকাকা। ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম ঘরে ঢুকেই।

কিন্তু মেয়েকে নাচাতে আর পারা গেলো না, বরং দেখা গেল তার চোখে মুখে কান্নার পূর্ব্বলক্ষণ।

পানুকাকাও বোধহয় একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কসরৎ করতে-করতে কাহিল মেরে যাচ্ছিলেন, ব'সে প'ড়ে বললেন—নাঃ, নাচ আজ আর হবে না দেখছি। স্বপ্নারাণী বিগড়েছেন! বললে বিশ্বাস করবেন না বৌদি, এমন ফার্স্টক্লাশ নাচে, দেখে তাক্ লেগে যায়। কে বলবে ভালো নাচিয়ের কাছে শেখেনি!...একদিন যদি আমাদের বাড়ী যান, দেখবেন!...বেশ স্বপ্না, নাচলে না তো? আচ্ছা তাহ'লে—জেঠিমাকে রেসিটেশান শুনিয়ে দাও।

আমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মা'র মুখের চেহারা দেখে নিজের মুখের ছবি বুঝতে পারছি কতকটা।

● ছেলেমানুষ আর কাকে বলে?

তবে পানুকাকা কিছুই বুঝছেন না, কারণ কারো মুখই তিনি দেখছেন না। পৃথিবী বিস্মৃত হয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নারাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে চলেছেন —হ্যাঁ, এমনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। বলো, এইবার সেইটে বলো! সেই যে— "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে—"

মা বোধহয় আর সহ্য করতে পারলেন না। হতাশ মুখে ব'লে ফেললেন— কি যে বলো—পানুঠাকুরপো, অতটুকু মেয়ে কখনো ওই সব শক্ত পদ্য বলতে পারে?

—পারে না মানে? উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন পানুকাকা—আগাগোড়া মুখস্থ! আর এমন এ্যাক্‌শান দিয়ে বলবে...বলো স্বপ্না! জেঠিমাকে চম্‌কে দাও এবার?

তা, চম্‌কেই দেয়। ক্ষণে-ক্ষণে চম্‌কে দেয়।

পানুকাকা বলেন—বলো, "ভগবান তুমি"—

স্বপ্না তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কলের পুতুলের মতো বলে—বগোবান তুমি...

—থামছো কেন? বলো,—"যুগে যুগে দূত"—

কলের পুতুলের ঠোঁট নড়ে—দুগে দুগে ভূত—

—আঃ, কি মুস্কিল! ভূত নয়, ভূত নয়! দূত! তা—খালি খালি থামছো কেন? তারপর? সেই যে সেদিনকে শিখিয়ে দিলাম?...বুঝলেন বৌদি, একটি দিন শিখিয়ে দিয়েছি, ব্যস!...কি শিখিয়েছিলাম স্বপ্না? বলো—? "পাঠায়েছো বারে বারে"—

কলের ঠোঁট কথা কয়—পাথায়েতো বায়ে বায়ে—

—নাঃ স্বপ্না, তুমি আজ বড্ডো চালাকি করছো?...কি দেখছো চারদিকে?

পানুকাকার ভাবখানা যেন স্বপ্না শুধু চালাকি করেই এই ক্যাব্‌লামি করছে! তাই মেয়েকে একটু নাড়া দিয়ে বলেন—আচ্ছা, পরে সব দেখো এখন বলো "দয়াহীন"—

—দআঈন...

—হ্যাঁ—তা' পর? 'সং'?

শুধু 'সং' বলেই ছেড়ে দেন বটে পানুকাকা, কিন্তু সে কি ছেড়ে দেওয়া? তাঁর চোখে মুখে যে উত্তেজনার অভিব্যক্তি, সেও দেখেছি খেলার মাঠে, দর্শকের মুখে চোখে।

বল যখন শুট্ করা হয়, মনে হয়, তারাই বুঝি শুট্ করছে চোখের ধাক্কা দিয়ে।

'সং' ব'লে সেই দৃষ্টি নিয়ে মুখিয়ে রইলেন পানুকাকা, কিন্তু কন্যার মুখ দিয়ে সেই 'সং'টুকু ছাড়া আর কিচ্ছু বার করতে পারলেন না। 'সং' ব'লে সঙের মতোই স্বপ্নারাণী তাকিয়ে রইলো বাবার মুখের দিকে।

দোষই-বা কি, ছেলেমানুষ বৈ তো নয়!

বাবা তার কী দুরূহ সাধনা করছেন তা বোঝবার বোধ জন্মায়নি এখনো।

কিন্তু, ধন্য পানুকাকা!

অপরিসীম ধৈর্য্য, অটুট মনোবল! তিনি ততক্ষণ গ্যাপ্ দেওয়ার পর আবার বললেন—বলো?—"সারে"!

স্বপ্না—স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বললো—সারে!

—"তারা ব'লে গেল—"

—তা'লা—

—"ব'লে গেল—"

—ব'লে দ্যালো—

মা'র কি হচ্ছে জানি না, আমার তো সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে, হাত জোড় ক'রে বলি—ক্ষ্যামা দাও পানুকাকা! কিন্তু পানুকাকার শরীরে 'ক্ষ্যামা' জিনিসটা কি আছে? আপ্রাণ অধ্যবসায়ে তিনি এই কবিতাটি সমস্ত বলিয়ে ছাড়লেন স্বপ্নাকে দিয়ে।

সবটা হয়ে গেলে, আলো-ভরা মুখে মেয়ের পিঠে একটু আদরের ঠোকা দিয়ে ব'লে ওঠেন—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন কথা শুনলে! আচ্ছা, এবার সেই ইংরিজি রেসিটেশানটা?

মা খাট থেকে নেমে পড়লেন।

● ছেলেমানুষ আর কাকে বলে?

প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে উঠলেন—রোসো ভাই, আগে ওকে মিষ্টি খেতে দিই, খেয়ে-দেয়ে তবে তো গলা ভালো ক'রে খুলবে?

বেশ বুঝলাম—উপর্যুপরি এই যম-যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারবেন না মা, তাই কিছু ইনটারভ্যাল্ চান।

কিন্তু মিষ্টির নামে আর এক প্যাঁচ্।

পানুকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন—মিষ্টি? কে খাবে? স্বপ্না?

—কেন, স্বপ্না একা খাবে কেন?...মা বলেন—তুমিও খাবে।

—আমি তো খাবোই, আমরা সেকেলে লোক। কিন্তু কন্যাটিকে তো জানেন না! সন্দেশ রসগোল্লা ছোঁয় না!

মা সাহসে বুক বেঁধে বলেন—তা ভালো ক্ষীরের কালোজাম আনিয়ে রেখেছি, তাই খাক্।

—কিছু না বৌদি, কিছু না। মিষ্টিমাত্রেই ছোঁয় না।

—তবে আম দিই...ব'লে মা তাড়াতাড়ি চলে যান, আর একটু পরেই আমার আনীত বস্তুগুলি সুসজ্জিত ক'রে নিয়ে আসেন।

পানুকাকার থালাটিই দেখবার মতো।

স্বপ্নার প্লেটে শুধু আম আর কাজুবাদাম।

দেখেই পানুকাকা হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন—তবেই হয়েছে!... কি রে স্বপ্না, আম খাবি?

এতক্ষণে যেন কলের পুতুলে প্রাণ সঞ্চার হয়। স্বপ্না বড় ক'রে ঘাড় নেড়ে প্লেটটি বাগিয়ে ধরে।

পানুকাকা এবারে একটু ছায়াময় হয়ে গেলেন। কিছুটা ঠাট্টার ভান করে বললেন—আমের আজ ভাগ্যি ভালো। অবিশ্যি ততক্ষণে নিজের হাত চালাতে সুরু করেন।

তারপর?

শোনো শোনো গল্প শোনো

যথাযথ বর্ণনা কি ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে পারবে তোমরা? আমরা যে আগাগোড়া দেখেছিলাম—মানে বাধ্য হয়েছিলাম, সে শুধু পানুকাকার সামনা-সামনি বলেই। যতই হোক—কাকামানুষ, তার ওপর আবার মস্ত বিদ্বান্! যার দুটো কথা শুনলেও জ্ঞান জন্মায়। আমাকে আগাগোড়া সব বিশদ দেখতে হয়েছে, তোমাদের তো তবু সর্টকাটে বলছি।

তারপর, স্বপ্না আমের প্লেট শূন্য ক'রে বললে—থন্দেত থাবো!

মা তাড়াতাড়ি সন্দেশ তুলে দিলেন তার পাতে। অবশ্য পানুকাকা হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন।

সেই হাঁ-হাঁ'র মধ্যে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয় তার সারার্থ এই হয়—স্বপ্নাকে সন্দেশ দেওয়া মানেই পিঁপড়েদের ভোজ দেওয়া। সমস্তটুকুই গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলাই নাকি তার 'সন্দেশ খাওয়া'! রোজ সকালে এইভাবে দুটো ক'রে সন্দেশ নষ্ট করে স্বপ্না, অতএব তুলে নেওয়া হোক।

কিন্তু স্বপ্না আর কলের পুতুলটি নেই।

সে প্রাণপণে সন্দেশ-সুদ্ধ প্লেটটা বুকে চেপে ধ'রে বলে—আঁ-আঁ, আমি থন্দেত থাবো।

—নে, তবে খা! দেখি, কেমন গলা দিয়ে নামাতে পারিস্! ব'লে পানুকাকা যেন রাগ করেই মেয়েকে অনুমতি দিয়ে নিজে দইয়ের বাটিতে চামচ ডোবান।

ইত্যবসরে স্বপ্না 'দুই চোখ ঠেলে বার হওয়া'-গোছ অবস্থায় সন্দেশটা তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে ব'লে ওঠে—দই থাবো!

—বাজে বকিস্‌নে স্বপ্না, তুই খাবি দই? তবেই হয়েছে।...জানেন বৌদি, আপনার কাছে বেশ একটা মজার চালাকি চালাচ্ছে! ও খাবে দই!

যেন দই খাওয়া একটা খেলো ব্যাপার।

এদিকে অথচ সরু সরু খোনা-খোনা গলায় আবদার চলেছে—দই থাবো...দই থাবো!

এক প্লেট শেষ হতেই বাপের থালার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে ব'লে ওঠে—

● ছেলেমানুষ আর কাকে বলে?

ওই 'গোল-গোল' থাবো!

শুনে রাগে দুঃখে লজ্জায় অপমানে পানু-কাকার চক্ষু গো ল - গো ল। মে য়ে কি ন্তু নির্ব্বিকার! এক-মনে 'গো ল-গোল' খাচ্ছে সে।

তবুও কেন জানি না, পানু-কাকা প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেন।—খে তে চাওয়াটা স্বপ্নার খাম - খে য়া লে র একটা খেলা মাত্র, বাড়ীতে জীবনে কোনোদিন এত খা র নি সে। আসলে সে না খেয়েই থাকে। বড়-জোর দু'-বেলায় দু'খানা মাছভাজা।

'দুই চোখ ঠেলে বার হওয়া'-গোছ অবস্থায় সন্দেশটা গিলে ফেলে—[পৃঃ—১৩৪

দুধ?

দুধ দেখলে সে 'তফাৎ হটে অমনি পঁচিশ হাত'।

ভাত?

ভাতের চেহারা কেমন তা স্বপ্না জানে না...ইত্যাদি।

আর এরই ফাঁকে-ফাঁকে স্বপ্না নিজের কাজ এগোতে থাকে।

পানুকাকার বারণের বাড়াবাড়ি অগ্রাহ্য ক'রে ও যা চাইতে থাকে, মা দিতে থাকেন। আর ওর কর্ত্তব্য ও পালন করতে থাকে।

'গোল-গোল' শেষ হোলে 'আর একটা থন্দেত।' 'থন্দেত' সাঙ্গ হোলে—'আবাল্ আম থাবো।' 'আবাল্ আম থাওয়া' হোলে—'বাদাম থাবো' 'বাদাম' নিঃশেষ হোল...'তপ্ থাবো'।

মা এবার একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

তাই ভুলিয়ে বলেন—চপ ছোটরা খায় না, ঝাল।

—না ধাল্ নয়, তপ্ থাবো!

—তবে ভাঙা খাও, কেমন?

ভাঙা নয়, আত্তো থাবো।

পানুকাকা বলেন—বৌদি আপনি করছেন কি?

মা হেসে বলেন—কি আবার? জেঠির কাছে আবদার করছে, দেবো না? একখানা খেলে কিছু অসুখ করবে না।

কিন্তু অসুখের কথা কেন!

পানুকাকা তো অসুখের কথা বলেন নি, বলছেন তাঁর মেয়ের 'নিখাকিত্ব'র কথা। তাঁর মেয়ে যে একটি 'ধনলক্ষ্মী' সেইটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

অথচ মেয়ের এই আবদার!

যাক, 'আত্তোই' হোলো।

ঠিক এই সময় পানুকাকার খাওয়া শেষ হয়েছে, উনি বাইরে গেছেন হাত ধুতে,

শোনো শোনো গল্প শোনো

ইত্যবসরে স্বপ্না নিজের থালাটি নামিয়ে রেখে বাপের থালা থেকে নিবিষ্ট হয়ে রস চাট্‌তে বসে।

ভীষণ হাসি পাচ্ছে আমার।

মনে হচ্ছে, আসুন পানুকাকা, দেখুন কীর্ত্তিটি।

বাচ্চা মেয়ে—সে নাকি মিষ্টি খায় না, সন্দেশ রসগোল্লা ছোঁয় না!

দরজার কাছে এসেই পানুকাকা দাঁড়িয়ে পড়েন।

ঠিক যেমন প্রথম এসেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমি।

আমার খুব হাসি পাচ্ছে, মা'র মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছি না—পাছে হেসে ফেলি। হঠাৎ এ কি? এর মানে?

বাপের থালা থেকে রস চাট্‌তে বসে।

● ছেলেমানুষ আর কাকে বলে?

দেখি পানুকাকাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

চমকে গেলাম। হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম।

নাটকীয় একখানি হাসির পর পানুকাকা ব'লে উঠলেন—ওঃ, বুঝেছি, আসল ব্যাপার বুঝেছি। ঠিক হয়েছে!...হাঁরে স্বপ্না, আজ সকালে তোর মামা এসেছিল না?

স্বপ্না আগেই বাবার অট্টহাসির আওয়াজে এদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়েছিল, এখন ফ্যালকা-মুখো হয়ে ঘাড় নাড়লো। যদিও তাতে 'হ্যাঁ' কি 'না' বোঝা গেল না।

পানুকাকা মা'র মুখের দিকে 'সহাস্য দৃষ্টি' না কি ক'রে যেন বললেন—বুঝলেন বৌদি, আসল ব্যাপার হচ্ছে, আজ সকালে ওর মামা এসেছিল; ও মোটে খায় না শুনে, প্রাইজ কব্‌লে গেছে। বলেছে—"একদিন যদি তুই সকাল থেকে রাত অবধি যা পাবি সব খেয়ে ফেলিস্‌, তাহ'লে একটা বড় 'ডল' দেবো—"...সেই ঝোঁকে মা-জননী রসগোল্লার রস সুদ্ধ সাঁটছেন! ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!...ইস্‌, ক'টা বাজলো? নটা? আরে! আর একটুও দাঁড়াবার সময় নেই বৌদি, ভীষণ একটা—ইয়ে—জরুরী কাজ রয়েছে। আর একদিন বরং আসবো।...স্বপ্না, শীগ্‌গির শীগ্‌গির!

মেয়ের রসমাখা হাতটাই বাগিয়ে ধ'রে পানুকাকা টপ্‌টপ্‌ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, কোনোদিকে না তাকিয়ে!

সাত বছর পরে নাকি পানুকাকা কলকাতায় এসেছেন!

আর এই সাত বছরের মধ্যে যখনি চিঠি-পত্র লিখেছেন তখনি জানিয়েছেন, আমাদের দেখবার জন্যেই নাকি কলকাতায় আসতে ইচ্ছে করে তাঁর!

জমিদার শশাঙ্কশেখর নাগচৌধুরী হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হলেন!

নিজের বাড়ীতে নিজের ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে রাতারাতি কর্পূরের মতো উপে গেলেন ভদ্রলোক! কোথায় যে গেলেন তার আর হদিশ মিললো না।...রোজকার মতোই রাত্রে শোবার পর চাকর মশারি ফেলে দিয়ে গেছে, দেখে গেছে সিগারেট খাচ্ছেন।...তারপর চাকর-বামুনরা খাওয়াদাওয়া করেছে, বাইরের সব দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে শুয়েছে, সকালে উঠে দেখে মানুষ নেই!

আজকালকার দিনে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা এমন অবাক কাণ্ড নয়, দৈনিক

শোনো শোনো গল্প শোনো

পাঁচ-সাতটা তো নিখোঁজ হচ্ছেই এই কলকাতা শহরে, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যাবে সে সবই পথে-ঘাটে বেরিয়ে।

নিজের ঘরে শুয়ে রাতারাতি বড় জোর খুন হতে পারে লোকে, কিন্তু এরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া? কই শোনা যায়নি তো এর আগে!

কোনো কারণে পথে বেরিয়েছিলেন এমনও প্রমাণ নেই।

সাত-আট জোড়া জুতো সবাই খোস-মেজাজে স্বস্থানে বসে আছে, এমন কি বাড়ীতে পরে বেড়াবার গোসাপের চামড়ার চটি জোড়াটি পর্য্যন্ত একচুল স্থানভ্রষ্ট হয়নি; খাটের নীচে পাপোষের ওপর যেমন পড়ে থাকে রাত্রে, ঠিক তেমনই আছে।

মাঝ-রাত্তিরে উঠে খালি পায়ে পাঁচিল টপকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হবেন—এতোখানি আর কে আশা করতে পারে একজন সুস্থ-মস্তিষ্ক ভদ্রলোকের কাছ থেকে? অন্ততঃ শশাঙ্কশেখরের মতো একজন রাশভারী এবং ওজনে ভারী প্রাচীন বয়স্ক ভদ্রলোকের কাছ থেকে?...কাজেই অনুমানের কোনো অবকাশই মিলছে না।

অথচ দু'মণ আঠারো সের ওজনের একটা লোক একেবারে বাতাসেই বা মিলিয়ে যায় কি করে?...

প্রথম টের পেল তাঁর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ।

ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগে একপেয়ালা কফি খাওয়ার অভ্যাস শশাঙ্কশেখরের বহু দিনের, ছেলেবেলায় মাদ্রাজে থাকতে এই অভ্যাসটি ধাতস্থ করেছিলেন তিনি।

অতো ভোরে গরু-দোয়া হতো না বলে 'কনডেন্সড্ মিল্ক' দিয়ে তৈরি করে আনতো রঘুনাথ। রঘুনাথের কাজের নড়চড় হয় না, শত বজ্রপাত হয়ে পৃথিবী উল্টে গেলেও কফির পেয়ালা নিয়ে মনিবের দরজায় এসে দাঁড়াতে ভোর পাঁচটার এক মিনিট এদিক-ওদিক হ'ত না।

রোজের মতো আজও সে—ট্রের ওপর কফির সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে এসে মনিবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পর্দার আড়াল থেকে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বার-দুই কেশেছে, কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া মেলেনি।

● ডিটেক্‌টিভ্ গল্প নয়।

শোনো শোনো গল্প শোনো

একটু ইতস্ততঃ করে রঘুনাথ আস্তে আস্তে পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে অবাক্, মশারি তোলা—বিছানা শূন্য!...মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে আন্দাজ করলো, বোধ হয় বাথরুমে গেছেন! যদিও ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মী শশাঙ্কশেখরের এটা সময় নয় প্রাতঃকৃত্যের, কিন্তু যতোই হোক মানুষের শরীর তো! একদিন এদিক-ওদিক হবে না এমন কথা জোর করে বলা চলে না।...এতো আর রঘুনাথের মতন 'কাজের যন্তর' নয়—হুঃ। সে বটে রঘুনাথের, চন্দর-সূয্যির নিয়মের বাড়া। নিজের মনেই অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে রঘুনাথ, কারণ দ্বিতীয়বার খাটুনী আছে তার। যদিও স্টোভ জ্বালতে সে শিখেছে অনেকদিন, তবুও সেই বিশ্বাসঘাতক জিনিষটা তার দু'চক্ষের বিষ। ওর 'শোঁ-শোঁ' শব্দের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনটা বড়ো অস্বস্তিকর।

কিন্তু কোথায় বা মনিব আর কোথায় বা কি!

কিছুক্ষণ পরেও যখন মনিবের ডাক কানে পেঁছিল না, রঘুনাথ আশঙ্কিত চিত্তে আবার ওপরে এলো, কিন্তু কর্ত্তা কই?...মশারির একটা কোণ হাওয়ায় দুলছে আর শূন্যঘর খাঁ খাঁ করছে।...বারান্দার পাশে কর্ত্তার যে নিজস্ব বাথরুম সেখানে উঁকি মেরে দেখলে—'মোজেইক্'-করা সীমেণ্টের মেঝে শুকনো খট্‌খট্ করছে—গত রাত্রি থেকে জল পড়েনি এটুকু বোঝা যায়।

তবে?

লোহার শরীর রঘুনাথেরও হাত-পা ঝিমঝিম্ করতে থাকে...কেমন একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পায় সে আশেপাশে!...তবুও সে হাঁদা নয়, মেদিনীপুরের ঘুঘু, কাজেই খবরটা বাড়ীর আর কারুর গোচরে আনবার আগে ধীরপায়ে ঢুকে পড়লো কর্ত্তার ঘরে। বালিশের তলা থেকে চাবিটা নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে ফেলে—যা কিছু ছিল—টেবিলের ড্রয়ারে যতোটা থাকা সম্ভব—হাতিয়ে টেবিলের তলায় একখানা কাগজ পড়ে ছিল কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ট্রাঙ্কে রেখে এসে দুম্‌দুম্ করে ধাক্কা দিলে শশাঙ্কশেখরের ভাগ্নে দিব্যেন্দুর ঘরের দরজায়।

দিব্যেন্দুর বরাবর ভূতের ভয়; তাই কি শীত কি গ্রীষ্ম, ঘরের দরজা-জানলা ভালো করে না এঁটে সে শোয় না।

শোনো শোনো গল্প শোনো

ধাক্কা খেয়ে—মানে শব্দের ধাক্কা খেয়ে—দিব্যেন্দু আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলো—কে? কে?

—দাদাবাবু আমি, আমি রঘুনাথ!...বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বাবু হারিয়ে গেছেন।

দড়াম করে খিলটা খুলে দেয় দিব্যেন্দু...দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে—কি বললি? মামা হারিয়ে গেছেন? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তার মানে?

—মানে আপনারাই বলতে পারেন দাদাবাবু, আমার তো হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

দিব্যেন্দু অবিশ্বাসের সুরে বলে—ভালো করে বাড়ীর সব দেখেছিস্—বাথ্‌রুম-টাথরুম?

—সে আর দেখতে কসুর করিনি, কোথাও নেই।

তবু দিব্যেন্দু বিশ্বাস করতে পারে না, বলে—হয়তো বেড়াতে-টেড়াতে বেরিয়েছেন।

—দাদাবাবুর এককথা! গেটের, খিড়কির, সকল চাবি আমার কাছে না?

—তাইত!...সত্যি দরজায় চাবি দেওয়া থাকলে মানুষ কিছু আর বেরোতে পারে না।

দিব্যেন্দু কয়েক সেকেণ্ড হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে বলে—ছাতে দেখেছিস?

—ছাতে?

সেটা অবশ্য রঘুনাথ দেখেনি, কিন্তু শেষরাত্রে উঠে বাবু ছাতে উঠে হাওয়া খাবেন এটাই বা ভাববে কি করে? বছর দুই বাড়ীখানা তৈরী করেছেন শশাঙ্ক-শেখর, কিন্তু একদিনের জন্যে ছাতে উঠতে তো দেখা যায়নি!...তবু—হতাশের আশা। রঘুনাথ ছাতে ছুটলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমেও এলো।

—নেই।

দিব্যেন্দু বললে—বিকাশবাবু উঠেছেন? তিনি কিছু—

● ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়!

—আজ্ঞে না দাদাবাবু, তাঁকে এখনো ডাকিনি, যতোই হোক আপনি ঘরের লোক আর বিকাশ দাদাবাবু নিষ্পর। আর বাবুর ওপর যা ছেদ্দাভক্তি তাঁর। বাবু যাই তাই—

—দুধ-কলা দিয়ে এই কালসাপ পুষছে—কি বলিস রঘু?

পিছন থেকে বিকাশের সহাস্য স্বর বেজে ওঠে!...বারান্দার ওদিকে তার ঘর, কখন যে সে [illegible] পিছনে দাঁড়িয়েছে, কে জানে বাবা!

ব্যাপারটা এই—যথার্থ 'আপনার' বলতে শশাঙ্কশেখরের দুনিয়ায় কেউ নেই। ...স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কিছুই না। কবে যে মরে ভূত হয়েছেন তাঁরা, তাও কেউ জানে না।

কিন্তু পয়সা আছে—কাজেই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের বশে পরগাছা এসে জুটেছে কিছু কিছু!...তবু নিকট বলতে এই দিব্যেন্দু, নিজের বোনের ছেলে।...আর আছে এই বিকাশ—শালীর ছেলে।...আছে মুরারি আর মুরারির বৌ—শশাঙ্কশেখরের পিসতুতো দাদার ছেলে-বৌ।...তাছাড়া অণিমা আছে—খুড়তুতো ভাইঝি...এবং চাকর-বামুন-ঝি-মালী ইত্যাদি এক গাদা।

প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলতে কেই বা?

অথচ বিরাট সম্পত্তির মালিক। শহরতলীতে ষোলো বিঘে জমির ওপর দেড় বিঘে জমি জুড়ে প্রকাণ্ড এই বাড়ীখানা করেছিলেন তিনি দু'বছর আগে—কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে।

এ অঞ্চলে এরকম ছেড়ে এর গোয়ালবাড়ী বা চাকরদের ঘরের মতো বাড়ীও বেশী নেই। জায়গাটায় এখনো গ্রামের মায়া মাখানো আছে কিছু কিছু, খোড়োঘর পচা ডোবারও অভাব নেই।

যাই হোক শশাঙ্কশেখরের শত্রু-টত্রু তো কেউ কোনোখানে আছে বলে মনে পড়ে না—অন্ততঃ কিড্‌ন্যাপ্ করে নিয়ে গুমখুন করবার মতো! অথচ সে ছাড়া আর কিই বা অনুমান করা যায়?

দিব্যেন্দু সামনে চক্ষুলজ্জার খাতিরে 'বিকাশ-দা' বললেও আড়ালে বলে 'বিকাশবাবু'। অবশ্য সম্ভ্রমসূচক 'বাবু' নয়—শ্লেষসূচক।

আপাততঃ সামনে দাঁড়িয়ে, তাই বলে—তোমার কি মনে হয় বিকাশ-দা?

এইখানে বলতে হয়—বাড়ীসুদ্ধ সকলে শশাঙ্কশেখরকে যথেষ্ট বা যথেষ্টর বেশী ভয়-ভক্তি শ্রদ্ধা-সম্মান করলেও, বিকাশের বরাবরই কেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাব।

মাসী মরে গেলে মেসোর ওপর ভক্তিছেদ্দা না থাকতেও পারে, কিন্তু মেসোর ঘাড়ে চড়ে রাম-রাজত্ব করে খাবো থাকবো অথচ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবো এ কেমন কথা বলোতো?

দিব্যেন্দুর কথায় একটা 'ফুঃ' করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বিকাশ বললে—রাতারাতি হয়তো কর্ত্তার সংসারে বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল, নিমাই-সন্ন্যাস বা গৌতমের গৃহত্যাগের মতো ব্যাপার আর কি!

দিব্যেন্দু বিরক্তভাবে বলে—পাখী হয়ে উড়ে তো যাননি?

—তা'হলে কেউ ফুস-মন্তরের চোটে উড়িয়ে দিয়েছে।

—তুমি তাহ'লে এটা সিরিয়াস্‌ভাবে নিচ্ছ না?...খুব রেগে গিয়ে বলে দিব্যেন্দু।

বেশ একগাল ধোঁয়া উড়িয়ে বিকাশ মুচকি হেসে বললে—বল কি, নিচ্ছি না মানে? ভদ্রলোক গেলেন গেলেন—উইলটা করে গেলেন না! বিষয়-টিষয়গুলো ভাগ-বখরা করে দিয়ে সন্ন্যাস নিতে হয়। এখন তোমাতে আমাতে, মুরারি-দা আর অণিমাতে, লাঠালাঠি করে মরতে হবে এই আর কি!

—লাঠালাঠি মানে?...গর্জ্জন করে ওঠে দিব্যেন্দু—তোমাদের সঙ্গে লাঠালাঠি কিসের? তোমরা কে? ছেলে না থাকলে ভাগ্নে ওয়ারিশান হয় এতো কচি খোকাটিও জানে।

—অনেক জিনিষ আছে যা কচি খোকারা জানে অথচ আবার বুড়োমদ্দারা জানে না। এই—ধরো যেমন বুড়ো আঙুল চুষতে—বলে আর একটু মুচকি হেসে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে সোপ্‌কেস হাতে নীচে নেমে যায় বিকাশ।...এবাড়ীর মধ্যে তার বাবুয়ানাটাই আবার বেশী।

● ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়!

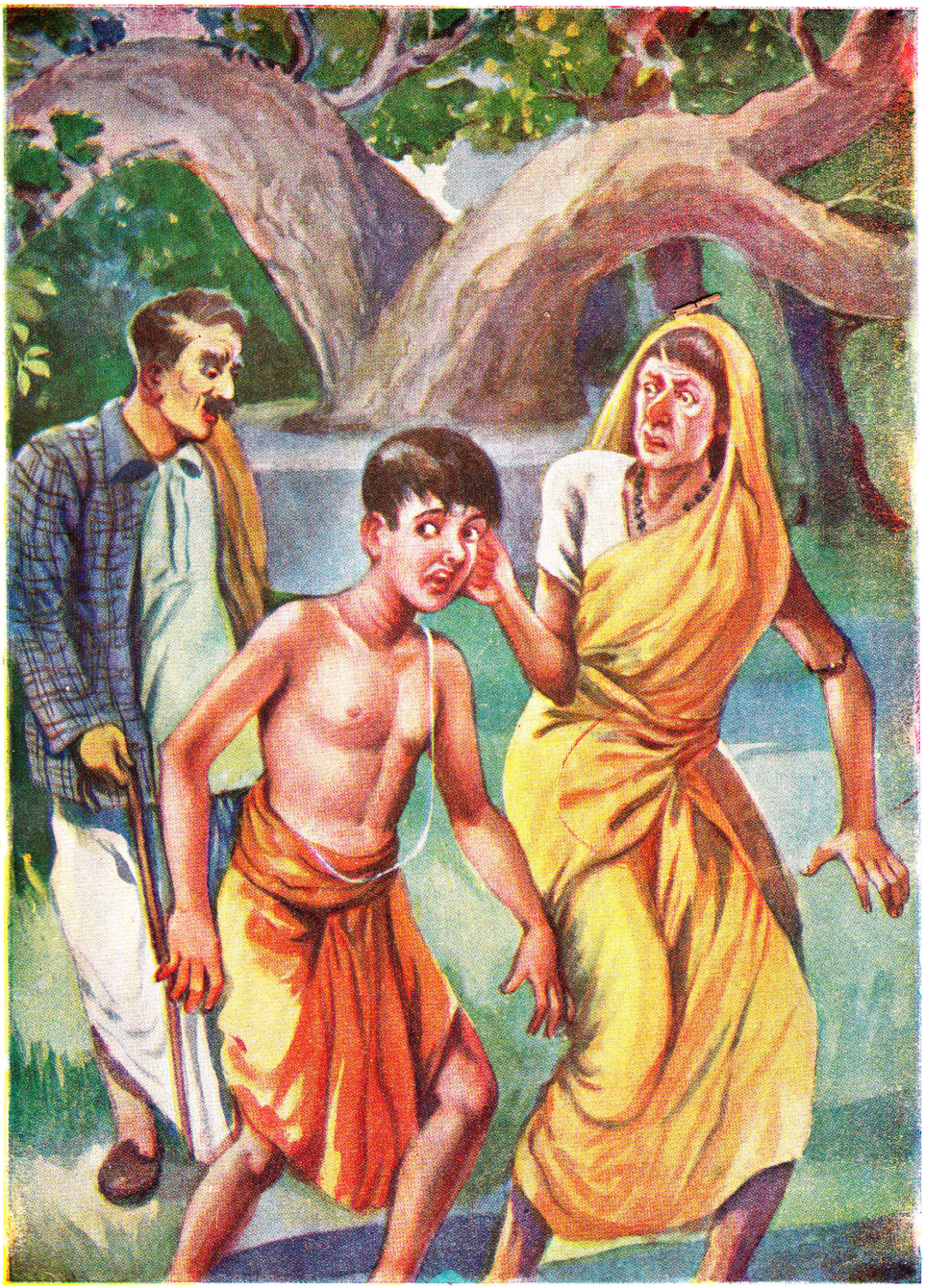

বাবার হাত থেকে জেঠির হাতে কানটা ট্রান্সফার হয়ে যায়।

দিব্যেন্দু দাঁত কড়মড়িয়ে বলে—দেখলি রঘু, দেখলি? কেমন দিব্যি আরামে চান করতে গেল, যেন কিছুই হয়নি!

—দেখছি বৈকি দাদাবাবু, দেখতে দেখতে রঘু বুড়ো হ'ল। এখন আপনারা দেখুন। আমার তো বিশ্বাস এর ভেতর ওনারও কিছু হাত আছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

বলে মিনিট দুই গম্ভীর মুখে সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে হঠাৎ মাথা নাড়া দিয়ে বলে ওঠে দিব্যেন্দু—কই আজ কি আর চা-টা পাওয়া যাবে না?

—আর চা!...রঘু হতাশভাবে বলে—উনুনেই যে আগুন পড়েনি এখনো। নীলমণিকে আমি ঘুম ভাঙাবো তবে তো?

—সে ব্যাটা এখনো ঘুমুচ্ছে? ভারী সব আস্‌পদ্দা বেড়েছে দেখছি; রোসো, সব সায়েস্তা করছি। মনে রেখো, এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা এই দিব্যেন্দু-শেখর।...যা, দুধ-চিনি সব নিয়ে আয়, ষ্টোভে তৈরি করে নিচ্ছি আমি। উঃ, কাঁচা ঘুমে উঠে মাথাটা চড়াৎ করে ধরে গেছে!

একগাল ধোঁয়া উড়িয়ে মুচকি হেসে বললে—[পৃঃ—১৪৪

রঘুনাথ চায়ের সরঞ্জাম আনতে গেলে দিব্যেন্দু আস্তে আস্তে কর্ত্তার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে।...গাটা একটু ছমছম করে বটে, মনে হয় ঘরের মধ্যে থেকে কে বুঝি হঠাৎ ধমকে উঠবে! কিন্তু যতোই হোক ইংরিজি-জানা ইয়ংম্যান, কুসংস্কারকে

● ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়!

প্রশ্রয় দেয় না।...মানুষ ঘরে না-থাকলে যে ধমক দিতে পারে না, এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি তার আছে।...

আর যদি ধমকের ভয়ই না থাকে, বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলতে দোষ কি? আর তাই যদি খোলা যায়, আলমারির লুকোনো খোপ থেকে আয়রণ-চেষ্টের চাবি নিয়ে 'চেষ্ট'টা খুলে ফেলে নগদ যা কিছু আছে বার করে নিতেই বা বাধা কিসের? বিশেষ তো আসল উত্তরাধিকারী যখন সে নিজেই।

ষ্টোভ জেবলে জল গরম করে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে পর-পর-দু' পেয়ালা চা খেয়ে দিব্যেন্দু পুলিশে খবর দিতে যায়। খবর একটা না দিলেই বা ভালো দেখাবে কেন?

ততক্ষণে বাড়ীর সকলে উঠেছে।

ঝি-চাকর-ঠাকুর-মালী কেউ কোনো কাজে হাত না দিয়ে জটলা করছে এবং কর্ত্তার বিয়োগ-ব্যথার চাইতে বেশী ক্ষুব্ধ হচ্ছে পুলিশের আগমন-বার্ত্তায়। এ যে শুধু তাদের জব্দ করার জন্যেই কে না জানে সে কথা?

গোলমালের সুযোগে—গেরস্থর কিছু বাসনকোসন-কাপড়চোপড় আর ঘি-তেল, আটা-চিনি বাপের বাড়ীতে চালান করা যায় কি না—তাই ভাবতে ভাবতে খুড়-শ্বশুরের জন্যে কাঁদছিল মুরারির বৌ, পুলিশ ডাকার খবরে বিরক্ত হয়ে চুপ করলো।

অণিমা ওঠে সকলের চেয়ে বেলায়। এতো গোলমালেও এতক্ষণ তার ঘুম ভাঙেনি, এইবার উঠে এসে স্থির হয়ে সব শোনে। তারপর গম্ভীরভাবে জ্যাঠার ঘরের দিকে এগোয়।

কিন্তু বুদ্ধিমান দিব্যেন্দু পুলিশ ডাকতে যাবার আগে সে ঘরে চাবি দিয়ে গেছে।

—এ ঘরে চাবি দিলে কে?

কেউ সাড়া দেয় না!

আরো গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করে অণিমা—বোধকরি বাতাসকে উদ্দেশ করে—

এ ঘরে চাবি দিলে কে?...আর একটু উচ্চস্বরে —এ ঘরে চাবি দিলে কে শুনতে চাই!

মুরারির বৌ এসে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে—দিবু ঠাকুরপো চাবি দিয়েছে—কিন্তু কি হবে ভাই অণিমা-ঠাকুরঝি? কাকাবাবু আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন?

—হবে তোমার মাথা। ফাঁকি কিসের তাতো বুঝতে পারছি না! তবে হ্যাঁ —অনেকেই হয়তো ফাঁকে পড়লো—ভেবেছিল বুড়োর মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু আদায় করে নেবে, সেইটি হ'ল না—এই আর কি!...বলে 'অনেকের' মধ্যে যে একজন সামনে দাঁড়িয়ে তার ওপর কুটিল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে অণিমা।

—সেতো ভাই তুমিও পড়লে! ভালোমানুষের মতো মুখে মুরারির বৌ বলে —উইল যখন করে যাননি।

—যাননি বলেই তো আমার কোনো কোশ্চেনই উঠছে না, বংশের মধ্যে যে একমাত্র আমিই আছি, সেকথা আশা করি ভুলে যাবে না কেউ।...বিরক্ত মুখে চলে যায় অণিমা, ঘরে ঢুকতে না পেরে।

কলেজে-পড়া মেয়ে, অনাবশ্যক কথা কয় না, এবং আইন-কানুনের সব কিছুই জানে।

দু'জন কন্‌ষ্টেবল্ সঙ্গে করে সি, আই, ডি বিভাগের ইনস্পেক্টর বি, মল্লিক এলেন দিব্যেন্দুর সঙ্গে।...যতোদূর কায়দা করে দেখা সম্ভব সেইভাবে সারা বাড়ীটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা ছাড়া আর কি-ই বা করবার আছে? জিনিষ চুরি যায়নি যে চাকরবাকরদের বাক্সপেটরা সার্চ্চ করবেন! সেই দু'মণ আঠারো সের ওজনের লাশটাকে গায়েব করবে এতোবড়ো সুটকেস আর কার আছে বল?

অবশেষে জেরা।

আহত নিহত বা নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে জেরার চোটে জেরবার করে ছাড়তে পারলে তবু মনে হবে কিছু করা হলো। তিনি কখন্ খেতেন, কখন্ শুতেন, কোন্ মার্কা নস্যি ব্যবহার করতেন, কি জাতের সিগারেট ভালোবাসতেন,

গতরাত্রে শেষ কার সঙ্গে কথা কয়েছিলেন, কোন্ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, সবকিছু অবগত হয়ে ইনস্পেক্টর বি, মল্লিক গম্ভীরভাবে বললেন—তাহ'লে আপনারা এবিষয়ে একমত যে রাত্রে বাড়ীর বাইরে যাবার মতো প্রত্যেকটি দরজা তালাবন্ধ ছিল?

—ছিল বই কি! সকাল পর্য্যন্ত দেখলাম যে!

দিব্যেন্দু বললে।

—একটা লোককে বাড়ীর বাইরে বার করে দিয়ে পুনরায় তালা লাগানো এমন কিছু শক্ত নয় এটা আশা করি বোঝেন?

এ সম্ভাবনাটা কারুর মাথায় আসেনি; মুখ-চাওয়াচায়ি করে মুরারি বলে উঠলো—চাবি তো বাবু রঘুর কাছে থাকে, আমাদের কি দোষ?

—দোষটা অবশ্য রঘুর ঘাড়েই পড়ছে—

বি, মল্লিকের কথার উত্তরে রঘু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে—তবে কি আপনি বলতে চান আমিই বাবুকে তাড়িয়ে দিয়ে দোরে তালা দিয়েছি?

—দেখ বাপু, আমরা টিকটিকি পুলিশের লোক; বলতে কিছুই চাই না, শুধু দেখতে চাই।...অতবড়ো মানুষটাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না এটা ঠিক?...

—ঠিকই তো—রঘু ঘাড় নাড়ে।

—উপে যেতেও পারে না মানুষ?

—নয়ই তো? আরো জোরে ঘাড় নাড়ে রঘু।

—তবে?

—আমি তার কি জানি বাবু?

রঘু হতাশভাবে হাত উল্টোয়।

—কিন্তু তোমাকেই যে জানতে হবে, কারণ চাবি তোমার কাছে।

—আজন্ম আমার কাছে চাবি থাকলো, কিছু হলো না, আর—

—ওহে বাপু, আজন্ম বেঁচে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন মরেও যায় তো মানুষ...একটা কিছু সিদ্ধান্ত তো করতে হবে আমাদের? ধরো—নিজের ইচ্ছেয়

যদি তিনি যেতেন, হয়তো কিছু লিখেটিকে রেখে যেতেন—কিন্তু তাঁর টেবিল ড্রয়ার আলমারি সব খোঁজা হলো, দেখলে তো?

রঘু অনেকক্ষণ থেকে উস্‌খুস্‌ করছিল, এইবার মরিয়া হয়ে হঠাৎ ট্যাঁক থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে বলে—এইটে দেখুন না, বাবু—

—এ কি? এ কোথায় পেলে?

—বাবুর ঘরে সকালে।

—"এতক্ষণ দাওনি কেন?"

—এতক্ষণ দাওনি কেন?

—কখন্‌ আর দিলাম বাবু? আপনারা তো আমাকে খুনের দায়ে ফাঁসি দিচ্ছিলেন! আমার দেবতুল্যি বাবু, তাঁকে কি না আমি—

রঘুনাথ আবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

—থামো!

থেমে যায় রঘুনাথ।

পুলিশের ধমকে লোকে পুত্রশোক ভুলে যায়, তা' এ তো মনিব-শোক!

কাগজখানা দেখে সকলেই হুমড়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু সেক্ষেত্রেও পুলিশের ধমক।...বি, মল্লিক নিজেই পড়তে থাকেন চেঁচিয়ে।

কিন্তু একি লিখেছেন শশাঙ্কশেখর!...একেই কি উইল বলা যায় না? মৃতের (মানে মৃত বলেই যদি ধরে নেওয়া যায়) শেষ ইচ্ছাই কি উইল নয়?...

"—আমি আর সংসারে থাকতে চাই না। বিষয় আমার বিষ লাগে...সমস্ত সম্পত্তি কাউকে দান করে কাশীবাস করবার ইচ্ছে আমার। কিন্তু একজনকে, মাত্র একজনকে—আমার এত সাধের ঘরবাড়ী জমিদারী যে টুকরো টুকরো করে পাঁচজনে ভাগ করে নেবে, এ চিন্তাও অসহ্য! কিন্তু কাকে?—কাকে?...প্রকৃত উত্তরাধিকারী যখন আমার নেই, তখন যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে তাকেই দিয়ে যাবো।... আচ্ছা, কে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে? অবশ্য বিকাশ রাস্কেলের নাম করতে চাই না। ওকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে। চামারটাকে এক পয়সাও দেব না। কখনই না। বরং বারো বচ্ছর ধরে ওর পেছনে যা খরচ হয়েছে আমার, তার একটা বিল করবো। করা উচিত, ও যা শয়তান! তাহলে—দিব্যেন্দু? সে তো বলে আমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে—আমারও তাই মনে হয়।...কিন্তু মুরারি? সেও তো প্রতিদিন আমার জন্যে কবরেজ-বাড়ী যায়। আমাকে সুস্থ রাখবার চিন্তায় নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে বেচারা...তাছাড়া বৌমাও—আমার বাত বাড়লে বৌমাই তো মালিশ করে দেয়, বেশী খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেও সেই বৌমাই ...অথচ আবার প্রতিদিন খবরের কাগজখানি পড়ে শোনানোর আলিস্যি নেই অণিমার।...এই সেদিন সাদা রেশমের ফুল তুলে এক ডজন রুমাল করে দিলে কে?... আচ্ছা, রঘুনাথকেই বা ফেল্‌না করা যায় কি করে? এমন বিশ্বাসী চাকর—আমার চাবি-পত্তর সব কিছুর খবর রাখে ও—"

কাগজের বাকী অংশটা সাদা। বোধকরি এইটুকু লিখতে লিখতে ভৌতিক

● ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়!

ভাবে উপে গেছেন ভদ্রলোক!...শশাঙ্কশেখরের 'শেষবাণী' শুনতে শুনতে নাড়ির গতি আর স্থির থাকে না কারুর।...নিশ্চয়...নিশ্চয় বিচারে যে সেই বেশী নম্বর পাবে এ বিষয়ে নিজের বিষয়ে প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহ হয়।

কেনই বা নয়? খিটখিটে বুড়োর মন রাখবার জন্যে কম কষ্ট স্বীকার করে এসেছে তারা এতদিন!

—আপনাদের তাহলে এখনকার বক্তব্য কি?

বি, মল্লিকের প্রশ্নে সকলেই চমকে উঠলো। বক্তব্য? তাদের আবার বক্তব্য কি?

অণিমা চটপটে মেয়ে—সেই আগে বলে উঠলো—আমাদের বক্তব্য তো তিনিই বুঝিয়ে গেছেন, এখন আপনাদের বিবেচনা।

এক ডজন এম্‌ব্রয়ডারি-করা রুমালের কাছে যে সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে, এ বিষয়ে সে স্থির-নিশ্চিত।

—সত্যি আমাদের আর বলবার কি থাকবে? কবরেজ-বাড়ীটা এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে এইটুকুই শুধু জানাতে চাই।—মুরারি বললে।

মুরারির বৌ কথা বললে না, শুধু ঘোমটার মধ্যে থেকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, মালিশ করে করে তার হাতে প্রায় কড়া পড়ে গেছে।

দিব্যেন্দু মুখের ভাবে যতোটা সম্ভব শোক ফুটিয়ে তুলে একটা রগ টিপে বসে রইল—উত্তর দিল না।...

রঘুনাথ? সে তো কেঁদে কেঁদে তেলচিটে গামছাখানা সজল করে তুলেছে। শুধু বিকাশ? তার কথা বাদ দাও, তার বিষয় তো যা বলবার স্পষ্টই বলে গেছেন শশাঙ্কশেখর। 'চামার' না হলে এ হেন দুঃখময় পরিস্থিতিতে কি না নিশ্চিত মনে পা নাচিয়ে নাচিয়ে সিগারেট খায়?

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে ইন্সপেক্টর বললেন, আর একটা 'এনকোয়ারি কেস' রয়েছে, সেখানে যেতে আর দেরী করলে চলবে না। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে এক ভদ্রলোক কাল রাত্রে লাইনে কাটা পড়েছেন—

—বলেন কি, এ্যাঁ! কাটা পড়েছেন? কি রকম দেখতে? দেখেছেন আপনি?

অনেকগুলি কণ্ঠ এক সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

—দেখেছি বৈকি! বি, মল্লিক চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—ভোরের দিকে ঘুরে এসেছি এক বার। মুখ চেনবার উপায় নেই, একেবারে থেঁৎলে গেছে—তবে রেস্‌পেকটেবল্‌ ভদ্রলোক বলেই মনে হলো। ফর্সা রং...হেল্‌দি চেহারা, তবে বয়েস হয়েছে বোঝা যায়—জালি গেঞ্জি আর আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে—

—সেই তো—সেই তো কাকাবাবু!

লোক-লজ্জা ভুলে ফুকরে ওঠে মুরারির বৌ।

বি, মল্লিক পুলিশি কায়দায় বলে চলেন—বাঁ হাতে দুটো আর ডান হাতে তিনটে আংটি—একটা হীরের, একটা প্রবাল, আর তিনটে—

—মামা ছাড়া কেউ নয়—ও আংটি আমিই এনে দিয়েছিলাম স্যাকরা-বাড়ী থেকে! হা ঈশ্বর! শেষকালে অপঘাত!

দিব্যেন্দু আর কথা বলতে পারে না, শুধু বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

বি, মল্লিক বলে চলেছেন—পকেটে রুমাল—কোণে সাদা রেশমে ফুল তোলা—

—সেই—রুমাল!...অণিমা ফিট্‌ হয়ে যাবার মতো হয়—হায়! ওঃ জ্যাঠামশায়, এতো ভালবাসতে যে আমার তৈরি রুমালখানিই বুকে করে—

ইজিচেয়ারে ঢলে পড়ে অণিমা।...

—'কাগে নিয়ে গেল কান'—বলে বিকাশই শুধু পা দোলাতে দোলাতে আর একটা সিগারেট ধরায়, কিন্তু ও নরাধমের কথা শুনছে কে?

বি, মল্লিক সকলের দিকে একবার করে চেয়ে বলেন—মৃতব্যক্তিই যে শশাঙ্ক-শেখরবাবু সে বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ?

—সে কথা আবার বলতে! হুবহু মিলে যাচ্ছে যে—

একসঙ্গে অনেকগুলো স্বর বেজে ওঠে।

—তা'হলে সনাক্ত করতে যাচ্ছেন আপনারা?

—সনাক্ত? সনাক্ত আবার কিসের? কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে তো।

—কিন্তু ভেবে দেখুন মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি—

ইন্সপেক্টর আর একটু হুঁস করিয়ে দেন।

● ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়!

—আর মুখ!—হতাশ-সুরে উত্তর দেয় দিব্যেন্দু—এ জীবনে কি আর সে মুখ দেখতে পাবো? মামার অমন 'গ্রীশিয়ান কাটে'র মুখের ওপর দিয়ে ইঞ্জিনের চাকা চলে গিয়ে জন্মের মতো থেঁৎলে গেল—

—বটেরে শয়তান! আয় তোর নাকটা ঘুঁসিয়ে থেঁৎলে দিই—

হঠাৎ পাশের ঘরের দরজা খুলে শশাঙ্ক চৌধুরীর প্রেতাত্মা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।...ফর্সা রং, হেলদি গড়ন, জালি গেঞ্জি আর আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, দু'হাতে পাঁচটা আংটি—বেশীর মধ্যে—সাধুভাষায় যাকে বলে—'আপাদমস্তক' বিচিলির কুচি লাগানো।

—ভূ—ভূ—মা—মা—

ঘুসি না খেয়েই গোঙাতে সুরু করে দিব্যেন্দু।

বিকাশ নিঃশব্দে উঠে পাখার রেগুলেটারটা শেষ অবধি ঠেলে দিয়ে—অবহেলার ভঙ্গীতে বলে—জামাটামাগুলো খুলে ফেলুন মেসোমশাই, সারারাত বিচিলির গাদায় ঘুঁসটে পড়ে থাকা—দুর্ভোগ তো কম নয়!

—সারারাত বিচিলির গাদায় পড়ে আছি তোমায় কে বললে হে বাপু?

শশাঙ্কশেখর (প্রেতাত্মা বলে মনে হচ্ছে না) খিঁচিয়ে ওঠেন।

—আমায়? বলবে আর কে? তবে পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো বুদ্ধি করে গোয়ালের বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এই ঢের। একেই তো এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হচ্ছে, তার ওপর আবার লঙ্কাকাণ্ড হ'ত আর কি!...বাইনোকুলার আর হাত আয়নাটা কি বিচিলির ঘরেই ফেলে এলেন নাকি?...

ইন্সপেক্টর বি, মল্লিক সকৌতুকে বলেন—আপনিই বা হঠাৎ গোয়াল-বাড়ীতে খুঁজতে গেলেন যে?

—সোজা কারণ! রেল-লাইন পর্য্যন্ত এগোবার আগে বাড়ীর কম্পাউণ্ডটা দেখাই সহজ মনে হলো। আর আধুনিক যুগের হলেও চারপেয়ে গরুরা এখনো এতো সভ্য হয়নি যে 'গোল্ডফ্লেক' সিগারেট খাবে। কাজেই—

—আচ্ছা আপনার একি খেয়াল বলুন তো?

শশাঙ্কশেখরের দিকে চেয়ে হো-হো করে হেসে ওঠেন বি, মল্লিক—উঃ রেল-

শোনো শোনো গল্প শোনো

লাইনের গল্পটা তো সন্ধ্যাবেলায় আমায় বলে এলেন, কিন্তু মুখস্থ করতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে? আর একটু হলেই বলে বসেছিলাম—'সিল্কের পাঞ্জাবী—লাল-ফুল রুমাল'—

—তাতেও ক্ষতি ছিল না মশাই! শোক এরা করতোই, না করে ছাড়তো না। ভয়ানক ভালোবাসে কিনা!

শশাঙ্কশেখর গম্ভীরভাবে বলেন।

বি, মল্লিক আবার হেসে ওঠেন—সেটা আমিও অনুমান করছিলাম। কিন্তু যাই বলুন, খেয়ালের কারণটা তো শুনলাম না?

—খেয়ালের কারণ? অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। তা সেটা হয়েছে—যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছে। যাক আপনার সামনেই বলে নিই—কাশীবাস করবার ইচ্ছেটা আমার প্রবল হয়েছে, কিন্তু সমস্যা এই বিষয়। বিষয় না বিষ—এ জিনিস কাকে দিই? এই যে সব দেখছেন? এরা আমায় এতো ভালোবাসে যে সাধ করে এদের ওপর এই বিষের জ্বালা দিতে চাই না। তবে হ্যাঁ—ওই স্টুপিড্, যেটাকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, তারই গলায় গেঁথে দিয়ে যাবো মনে করছি।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলে ওঠে—রক্ষে করুন মেসোমশাই, তা'হলে আবার এঁরা আপনাকে ছেড়ে আমাকে ভালোবাসতে সুরু করবেন। তার চেয়ে সৎকাজে দাতব্য করে দিন না! নোয়াখালির দুর্গত তো ফুরিয়ে যায়নি এখনো?

অনেকক্ষণ আগে গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করা হয়েছে, সে গাড়ী অপেক্ষা করছে—দেবুর জন্যে। আজ আর ও-গাড়ী চড়ে বাবা কাকা অফিস যাবেন না, দেবুর জন্যে রিজার্ভ আছে। দেবুর মান্য আজ দেখে কে! যে দেবু জন্মে-জীবনে ডাব খায় না, তা'র জন্যে ডাব আনানো হয়েছে, দুপুরে পাছে গলা শুকোয়।...শুধুই কি ডাব? দুধ-সন্দেশ, ফল, বিস্কুট, দেবুর এক সপ্তাহের টিফিন একদিনের জন্যে যোগাড় করা হয়েছে।

কপালে দইয়ের ফোঁটা, পকেটে ঠাকুরের নির্ম্মাল্য, মুখে আনন্দ আর হৃদকম্পের ভাব, ঠাকুর-ঘর থেকে প্রণাম সেরে নেমে এলো দেবু।...এখন যাবতীয় গুরুজনদের প্রণাম পর্ব্ব।

"সকলের আগে দাদুকে, বুঝলি তো?"...দেবুর মা দেবুকে ভব্যতার নীতি শেখান..."দাদুর পরে আর সবাই।"

শোনো শোনো গল্প শোনো

"আচ্ছা" বলে দেবু তাড়াতাড়ি দাদুর ঘরের দিকে ছোটে। যদিও এখনো হাতে ঘণ্টাদেড়েক সময় আছে, আর দোরে হাওয়া গাড়ী মজুত আছে, তবু প্রাণের ভেতর ধুকপুকুনি। আজ প্রথম দিন, 'সীট্' দেখে নিতে হবে, কে জানে সেই দেখা-দেখির অবসরে কোন্ ফাঁকে দেড়ঘণ্টা সময় হাওয়া হয়ে যাবে।

নার্ভাস হয়ে গিয়ে কতো ছেলে নাকি সামনে নিজের সীট্ দেখেও আবার ঘুরে সারা হয়, এসব দেবুর অনেক শোনা আছে। সেও যদি 'হল্'এ গিয়ে নার্ভাস হয়ে যায়, এই ভাবনায় ভাবনায় বাড়ীতেই নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

প্রায় ছুটে এসেই দাদুর দুখানা পায়ে ছোবল মারার মতো দুটো হাত একবার ঠেকিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালো দেবু।

দাদু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ প্রণাম যে?...সহসা গো-ব্রাহ্মণে ভক্তির উদয় হ'লো বুঝি?"

"বাঃ আজ পরীক্ষা নয়?"

"পরীক্ষা!" দাদু ইজিচেয়ারে-ঢালা অঙ্গ তুলে খাড়া হয়ে বসলেন, বললেন, "পরীক্ষা দিতে যাচ্ছো নাকি তুমি?"

"পরীক্ষা দিতে যাবো না?" হতভম্ব দেবু দাদুর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বলে, "আজই তো বারো তারিখ!"

"বারো তারিখ তা' আর তোমায় বলে দিতে হবে না হে, চারটে দেয়ালে ছটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, টেবিলে খবরের কাগজ, হাতে পাঁজি! কথা হচ্ছে—আজ তো যাওয়া হবে না।"

"যাওয়া হবে না?"

দেবু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দাদুর মুখের দিকে। দাদু কি হঠাৎ কোনো দৈবাদেশ পেলেন নাকি? ভবিষ্যৎবাণীর মতো অমনি ঘোষণা করে বসলেন—"যাওয়া হবে না!"...কাতর ভাবে দেবু বলে—"কেন দাদু, অমন অপয়া কথা বলছেন?"

"অপয়া কথা আমি বলছি না দেবু, বলেছেন পঞ্জিকা। পর্শু দুপুরে আমি তোমার মাকে বলে দিয়েছি, পরীক্ষা দিতে যাওয়া হবে না, আজ যাত্রা নাস্তি, আর

তুমি কিনা ফর্সা পোষাক পরে কপালে দই লেপে একেবারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত? ওসব সাজগোজ খুলে ফেলো ভায়া, খুলে ফেলো! যাওয়া হবে না, যাত্রা নাস্তি, ছোটখাটো কিছু নয়, একেবারে মঘা!"

"মঘা? মঘা মানে?"

"মঘা মানে জানো না? হিন্দুর ছেলে না তুমি?...মঘা অশ্লেষা জানো না? হাজার বছর আগে খনা বলে গেছেন—'মঘা, এড়াবি ক'ঘা?'...হবে না, হবে না, যাওয়া-টাওয়া হবে না! বৌমা...বৌমা!"

দেবুর আজ স্কুল-ফাইন্যালের প্রথম দিন, এমনিতেই ওর কথা কইতে গিয়ে গলা কাঁপছে, চোখটা জল ভরা-ভরা হয়ে আসছে, তার ওপর কিনা, দাদুর এই চিত্ত-চমৎকারকারী আদেশ!

"মঘা বলে পরীক্ষা দিতে যাবো না?"

"না যাবে না! 'পরীক্ষা' বলে কথা। ওটা কি যা তা জিনিস নাকি? তায় আবার প্রবেশিকা! উচ্চ শিক্ষার প্রবেশ দ্বার—অদিনে অক্ষণে গেলেই হলো? শাস্ত্রে আছে—অযাত্রায় যাত্রা করলে কার্য্য পণ্ড, মনস্তাপ, শরীর-ক্লেশ! যাও ফর্সা জামা কাপড় ছেড়ে ফেলো গে, দইয়ের ফোঁটা মোছো, ঘরে বসে লেখাপড়া করো। বৌমা...বৌমা!"

দেবুর আর কথা জোগায় না, প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বেরিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে আছড়ে পড়ে "দাদু পরীক্ষা দিতে যেতে দেবেন না!"

"যেতে দেবেন না!! সে কি—দূর তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন!"

ঠাট্টা!

দেবুর ধড়ে প্রাণ আসে "ওঃ ঠাট্টা! তা'হলে এবার তোমাকে?" হেঁট হয়েছে কি না, পায়ে হাত ঠেকেওনি, দাদুর জোর গলা ভেসে এলো "বৌমা—বৌমা!"

দেবুর মা ছুটে গেলেন "বাবা ডাকছেন?"

"ডাকবো না? ডাকবো না তো কি? একশোবার ডাকবো। বলি বৌমা, পরীক্ষাটা কি ছেলেখেলা?"

"কেন বাবা?"

শোনো শোনো গল্প শোনো

"আজ এই মঘা নক্ষত্রে দেবুকে পরীক্ষা দিতে যেতে দেবে?...ওসব কুমতলব ছাড়ো বৌমা ছাড়ো।"

দেবুর মা হেসে ফেলে বলেন, "কুমতলব তো দেখছি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি করেছে, আমার কি দোষ?"

"দোষগুণ বুঝিনা বৌমা, মোট কথা যাওয়া হবে না। হাজার বছর আগে খনা বলে গেছেন—মঘা এড়াবি ক' ঘা। সে বিধি মানতে চাওনা তোমরা? না, না! ওসব সায়েবিআনা ছাড়ো।"

বলে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পাঁজি পড়তে থাকেন দাদু!...হ্যাঁ পাঁজি পড়াই দাদুর পেশা। অহরহ পড়ছেন। আগাগোড়া দাদুর মুখস্থ! দাদু আছেন, পাঁজি নেই, এ দৃশ্য কেউ কখনো দেখেনি।...দেবুর এক বন্ধু একবার চুপি চুপি বলেছিলো, "দেখ্, ঈশ্বর না করুন তোর দাদু যদি কখনো হারিয়ে যান, বা বাড়ী থেকে পালিয়ে যান, খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হবে না। কাগজে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের' কলমে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিবি,—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভৌমিক, বয়স আটাত্তর, লম্বায় ছ'ফুট, রং ফর্সা, সাদা দাড়ি, চোখে চশমা, হাতে পাঁজি, মাতৃভাষা বাংলা। যদি কেহ অনুগ্রহ করে—

দেখবি তিন দিনের মধ্যে কেউ না কেউ ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে যাবে।...সব সময় পাঁজি হাতে, এমন ব্যক্তি কি আর দুটো আছে?"

দাদু এসব ঠাট্টা তামাসা শুনলে মিটি মিটি হাসেন আর বলেন, "তোমরা ওর মর্ম্ম কি বুঝবে হে? ওটি হচ্ছে জ্ঞানের খনি। কী নেই ওতে? যা চাইবে তাই পাবে।"

সে যাক, এদিকে দেবুর যে প্রায় কেষ্ট পাবার দশা! দেবুর মায়েরও তথৈবচ!

"বাবা! সব ছেলেই তো যাবে আজ!"

"সব ছেলে যদি বিষ খায়, খেতে দেবে তোমার ছেলেকে?"

দেবুর মা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।...ওদিকে দেবুর বাবা ডাকা-ডাকি করছেন—"আর কিসের দেরী? দেবু দেবু! নাঃ এতো আগে থেকে তোড়জোড় করেও শেষ পর্য্যন্ত দেখছি দেরীই হয়ে যাবে।—"

দেবুর বাবার বাবা উঠে এলেন। উচ্চকণ্ঠে হাঁকলেন, "পটলা!"

"আজ্ঞে যাই!...কি বলছেন?"

"বলছি, জগতের এই কোটি কোটি লোক বারোটি রাশি আর সাতাশটি নক্ষত্রের অধীনে চলছে তা জানো?"

দেবুর বাবা থতমত খেয়ে বলেন, "জানিতো!"

"জানো কিন্তু মানোনা, কেমন? কিন্তু বাপু এসব ব্যাপারে না মানলে চলবে না। ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো! হাজার বছর আগে খনা বলেছেন 'মঘা, এড়াবি ক' ঘা!' বেরোলেই বিপদ অনিবার্য্য! আর কার্য্য পণ্ড তো বটেই!"

দেবুর বাবার তো মাথা ঘুরে গেছে!

তিনি সাধ্যসাধনা করতে থাকেন বাবাকে। ওদিকে দেবু ঘড়ি দেখে আর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। দেবুর মা কাঁদতে থাকেন।

একদিকে শ্বশুর গুরুজন; আর অপর দিকে বেচারা দেবুর জীবন মরণ।

কিন্তু কি করবেন, দেবুর দাদু অচল অটল!...অশ্লেষা নয়, তেরোস্পর্শ নয়, একেবারে মঘা! খনা বলে গেছেন 'এড়াবি ক' ঘা?'

অবশেষে যখন আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে হাতে, হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো দেবু। আর ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠে দেবুর মা শ্বশুরের পায়ে এসে পড়লেন "আজকের দিনটা আপনার পাঁজি বন্ধ করুন বাবা, নইলে দেবু আমার প্রাণে বাঁচবে না!" তখন দাদু গম্ভীরভাবে বললেন, "বেশ! যাক! তবে আমার কোন দায়িত্ব নেই! কিন্তু জেনে রেখো বৌমা, এ সব তোমাদের আজকের যুগের খট্ মট্ ফট্ বিদ্যে নয়, হাজার বছর আগের বিদ্যে। খনা বলে গেছেন—"

ততোক্ষণে দেবুর বাবা দেবুকে নিয়ে হাওয়া গাড়ী চড়ে হাওয়া!

দেবুর মা নিশ্বাস ফেলে সরে যান, আর দেবুর দাদু দালানে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে সচীৎকারে স্বগতোক্তি করতে থাকেন, "ঠেকাবে কার সাধ্যি? বিপদ অনিবার্য্য! খনা বলেছে—"

হ্যাঁ, এসব হলো দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটের কথা, আর দেবু ফিরে এলো দশটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে!

"ঘণ্টা পড়ে গেছলো তো?"

দেবুর ফিরে আসার কথা বলছো?

তা ফিরে না এসে কি আর বেচারা সারাদিন ফুট-পাথে বসে থাকবে? এক-বার অবিশ্যি বসে পড়ে-ছিলো ফুটপাথে, দেবুর বাবা আর ড্রাইভার দুজনে মিলে কোলে করে গাড়ীতে তুলে নিয়েছেন।

দালানেই ঘুরছিলেন দাদু, দেবুকে ধরে ধরে আনা হচ্ছে দেখে ছুটে এসে বললেন, "এ কী? কি হয়েছে? পটলা?"

ভক্তিমান পটলাও আজ বাপের উপর খাপ্পা! তাই ক্রুদ্ধ স্বরেই বলে—"যা হবার তাই হয়েছে। ঘণ্টা পড়ে গেছলো।"

দাদুর মুখখানি সহসা আনন্দে ফরসা হয়ে ওঠে, বলেন, "ঘণ্টা পড়ে গেছলো তো?"

"যাবে না? দেবুর জন্যে তো আর স্পেশাল ব্যবস্থা হতে পারে না?...

দাদু মাথা নেড়ে বলেন, "পারে নাই তো! আমিও তো তাই বলছি। হাজার বছর আগে শাস্ত্র তৈরি হয়েছে, সে কি আর তোমার দেবুর জন্যে নড়ে চড়ে বদলে যাবে?...জ্যোতিষ শাস্ত্র বলেছে—যাত্রা নাস্তিতে যাত্রা করলে 'কার্য্যপণ্ড, মনস্তাপ, শরীর-ক্লেশ!' বলি কোন্‌টা না হলো? কোন্‌টা না হলো? বৌমা—বৌমা, দেখে যাও! বলি বারণ করেছিলাম কি না পরশু দুপুরে?"

দেবু আর সহ্য করতে পারে না, চীৎকার করে বলে ওঠে—"শাস্তর না কচু! হাতীর ডিম, ঘোড়ার ডানা! আপনিই তো যতো নষ্টের গোড়া!"

দাদু কিন্তু এতো বড়ো দোষারোপেও বিচলিত হন না, দিব্য হাস্যবদনে বলেন —"সে তো হতেই হবে! কথায় বলেছে 'মঘা, এড়াবি ক' ঘা?' একটা ঘা' হলাম আমি। অবিশ্যি ইচ্ছে করে কি আর হলাম, গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত আমায় করালো! নিমিত্ত মাত্রং...এই আর কি! বলি বৌমা, সাহেবের মেয়ে বিশ্বাস হলো? হতেই হবে, হাজার বছরের থিয়োরি!...ডাব এসেছিলো না? দাও দাও ছেলেটাকে। মুখটা শুকিয়ে গেছে ছেলেটার! যা রোদ!"

প্রসন্নতায় আর আত্মগৌরবে জ্বল-জ্বল করতে থাকে দাদুর মুখখানি। হবে না কেন? নিজের কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হলে কার না মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে!

দেবুকে কি আর ভালোবাসেন না দাদু? বাসেন, খুবই বাসেন। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী ভালোবাসেন পাঁজিকে। দেবুর যা হলো তা' তো হলো! কিন্তু পঞ্জিকার তো জয় হলো?

সকালবেলা উঠে মুখ ধুতে গিয়েই হারুবাবুর নজরে পড়লো ট্যাঁপা ঘরে নেই।...সঙ্গে সঙ্গে জুতোর র‍্যাকের দিকে নজর দিলেন, দেখলেন সেখানে ট্যাঁপার জুতো নেই।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে গায়ের রক্ত মাথায় চড়ে বসলো ভদ্রলোকের। হাঁক দিলেন—ট্যাঁপা!

সাড়া পাওয়া গেলো না কোনোদিক থেকে।

অতএব সন্দেহ সত্যি। এই সক্কালবেলাই বাবু আড্ডা দিতে বেরিয়েছেন। তবু অনুপস্থিত ট্যাঁপার ওপর রাগ ফলাতেই বোধ হয় গলার শব্দ আকাশে তুলে ডাক ছাড়লেন—ট্যাঁপা!

ট্যাঁপার সাড়া অবশ্য এবারেও পাওয়া গেলো না, তবে ভাঙা কাঁসরের বাদ্যির মতো আর একটি শব্দ পাওয়া গেলো। ঠাকুর-ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে

শোনো শোনো গল্প শোনো

ট্যাঁপার মেজজেঠী বললেন—সক্কালবেলা উঠেই "ট্যাঁপা ট্যাঁপা" করে বাড়ী মাথায় করছো কেন ঠাকুরপো, কী দরকার তোমার ট্যাঁপাকে?

—দরকার আবার কি? হারুবাবু খিঁচিয়ে ওঠেন—সক্কালবেলাই নবাব-পুত্তুরের কোথায় কী রাজকার্য্য পড়লো শুনতে পাই না?

মা-মরা ট্যাঁপাকে ট্যাঁপার এই মেজজেঠীই ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, কাজেই ট্যাঁপা-সংক্রান্ত যা কিছু নালিশ তাঁর আদালতেই পেশ করা হয়।

রোগা লম্বা খটখটে চেহারা, মাথাটি কদম-ছাঁট, পরণে তসর কিংবা মটকার থান ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পুজো করবার সময় আর শোবার সময় ছাড়া অন্য সব সময় পায়ে একজোড়া পেতলের গুলো বসানো খড়ম। খড়ম পরেই রান্না-বান্না সব করেন মেজজেঠী।

শুনে অবিশ্বাস করছো? ভাবছো এমন দৃশ্য তো কখনো দেখিনি? অবিশ্বাসের কিছু নেই। জগতে এমন কতো অদ্ভুত দৃশ্য আছে, যা তোমরা কখনো দেখোনি।

—খড়ম তিনি পরেন।

তার কারণ, তাঁর মতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই তো 'মেলেচ্ছ কাণ্ড', তার থেকে নিজেকে যতটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায়! খড়ম পরলে তো তবু পৃথিবীর ধুলো-মাটি মাড়িয়ে মরতে হবে না।

ট্যাঁপাকে তিনি প্রাণতুল্য দেখেন, কিন্তু ওই! এতটুকু 'অনাচার' চলবে না। বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোলেই বাড়ী ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে গঙ্গাজল মাথায় দিতে হবে! বাজারে গেলে কাপড় ছাড়তে হবে। স্কুলের পোষাক-টোষাক রাখবার জন্যে নীচের তলায় কয়লা ঘুঁটের ঘরে একটা আলনা টাঙানো আছে; ভিজে গামছা পরে, সেইখানে সেইগুলি রেখে এসে গা ধুয়ে মুছে তবে 'বাড়ীর জামা' পরা চলবে।

এছাড়া 'খাবার জামা' 'শোবার জামা' সব আলাদা আলাদা। কে জানে কোনদিন যদি মেজজেঠীর অগোচরে জামা এঁটো করে বিছানা-পত্তর সব মেলেচ্ছ কাণ্ড করে বসে?

এসব কিছু বাড়িয়ে বলছি না বাপু, বরং আরো অনেক আছে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

ট্যাঁপাতো তুচ্ছ কথা, মেজজেঠীর হাতে তাঁর গুরুদেবের নিস্তার আছে? গুরুদেব নবদ্বীপে থাকেন, মাঝে মাঝে শিষ্যবাড়ী আসতে তো হয়? তা রেলগাড়ী চড়ে আসেন বলে মেজজেঠী তাঁকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখে দোতলার বারান্দা থেকে একঘড়া গঙ্গাজল হড়হড় করে মাথায় ঢেলে দিয়ে, তবে ছুটে নীচে এসে চরণ বন্দনা করেন।

তাই শীতকালে বর্ষাকালে মেজজেঠীর ভাগ্যে গুরুদর্শন ঘটে না।

গুরু বলে তো আর সত্যি ওয়াটার-প্রুফ্ নন তিনি? প্রাণের মায়াও বিসর্জ্জন দিতে পারেন না!

সে যাই হোক্, হারুবাবুর কথার উত্তরে মেজজেঠী বললেন—রাক্ষসের মতো চেঁচিও না বাপু, সে গেছে গঙ্গাস্নানে—

—অ্যাঁ। গঙ্গাস্নানে? তার মানে?

—মানে আবার কি? হিঁদুর ছেলে, গঙ্গাস্নানে গেছে, এটুকুর মানে বোঝাতে মাষ্টার ডাকতে হবে নাকি?

হারুবাবু আর মেজগিন্নী, দুই দ্যাওর-ভাজ তুল্যমূল্য। হারুবাবুও সপ্তমে চড়ে বলেন—হ্যাঁ হবে। সক্কালবেলা উঠে বলা নেই, কওয়া নেই, ট্যাঁপা হঠাৎ গঙ্গাস্নানে গেলো, একথা বুঝতে মাষ্টারই লাগবে।

তবে আমিই মাষ্টারী করি—বলে খড়ম খটখটিয়ে বেরিয়ে আসেন মেজগিন্নী! বেশী এগোন না, কি জানি যদি কোথায় কিছু অছ্যুৎ-জিনিষ মাড়িয়ে মরেন।

হাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে বলেন—বলি কাল রাত্তিরে নেমন্তন্ন খেয়ে আসেনি ট্যাঁপা? সে কি গঙ্গাজলে হবিষ্যি খেয়েছিলো?...মাংস খায়নি? ডিম খায়নি? প্যাঁজ-রসুন খায়নি? বলে কি না 'হঠাৎ গঙ্গাস্নান করতে গেলো কেন?' বিলেত থেকে এলে নাকি?

হারুবাবু স্তম্ভিত ভাবে বলেন—মাংস ডিম খেলেই গঙ্গাস্নান করতে হয় ট্যাঁপাকে?

—আকাশ থেকে পড়লে নাকি? জানো না?

হারুবাবু হঠাৎ গুম্ হয়ে যান। বলেন—না, জানতাম না। কই আমি তো—

—শোনো কথা! তোমাকে আমার কি দরকার? ট্যাঁপা আমার ঠাকুরের বাতাসা আনে—সময় অসময় আমার ঘরে ঢোকে।

আবার ঘরে ঢুকে পড়েন মেজগিন্নী।

হারুবাবু একচক্কর ঘুরে এসে বলে ওঠেন—গঙ্গাস্নানে গেছে যদি তো জুতো পরে কেন?

—জুতো?

মেজজেঠী আবার বেরিয়ে আসেন।

—কি বললে ঠাকুর-পো? জুতো পরে গঙ্গায় গেছে ট্যাঁপা? ও মা, আমি কোথায় যাবো? আমি যে তাকে আসবার সময় ঘাটের ধারের দোকান থেকে প্যাঁড়া আনতে বলে দিয়েছি গো? জুতো পরে এনে আমার পাঁচ-পাঁচসিকে পয়সাই জলে দেবে গো! আসুক সে এক-বার! মজা দেখাচ্ছি!

"জুতো পরে আমার প্যাঁড়া এনেছো—" [পৃঃ—১৬৬

অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে ভাঁড়ারের দরজার কাছে আনাগোনা করতে থাকেন মেজজেঠী।

বৌদির সেই মূর্ত্তি দেখে হারুবাবু যে হারুবাবু, তাঁর মুখেও বাক্য সরে না।

কিছুক্ষণ পরে রঙ্গমঞ্চে ট্যাঁপার আবির্ভাব!

সে বিনা দ্বিধায় গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ঢুকছিলো, মেজজেঠী 'রে রে' করে ওঠেন—ও হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বড্ডো তুমি সাহেব হয়েছো না? জুতো পরে আমার প্যাঁড়া এনেছো—

ট্যাঁপা একটু শিউরে উঠেই গম্ভীর ভাবে বলে—প্যাঁড়া আনিনি!

—আনিসনি! তা বেশ, তবু ভালো। তবে দে পয়সা ফেরৎ দে।

—পয়সা তোমায় আমি পরে ফেরৎ দেবো মেজজেঠী।

—পরে? কেন, সে পয়সা কোথায় ফেললি? জলে পড়ে গেছে?

ট্যাঁপা করুণ ভাবে বলে—পড়ে যায়নি, ফেলে দিয়েছি।

—ফেলে দিয়েছিস? সক্কালবেলা এসেছিস আমার সঙ্গে তামাসা করতে?

—সত্যি কথা বললে তো তুমি বিশ্বাস করবে না।

—বিশ্বাসের যুগ্যি কথা তা হলে নয়, তাই বল্!

ট্যাঁপা গম্ভীর ভাবে বলে—সত্যিই নয়, মেজজেঠী, এখন ভাবছি, আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলাম? বাঁ হাতের মুঠোয় পয়সাগুলো চেপে ধরে ডুব দিতে যাচ্ছি —এমন সময় কে যেন জলের তলা থেকে—না তুমি বিশ্বাস করবে না মেজজেঠী—

মেজজেঠী কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বলেন—বিশ্বাস করা না-করা আমার ইচ্ছে, তুই বল্ই না শুনি!

ট্যাঁপা একবার মাথাটা চুলকে, একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি বলে—কে যেন জলের তলা থেকে বললে—'এই এখানে চলে আয় না!'

মেজজেঠী চমকে উঠে বললেন—তুই ঠিক শুনেছিস্?

—শুনবো না?...একবার কি? একবার দু'বার তিনবার।

—তুই কি বললি?

—বলবো কি? ট্যাঁপা চোখ গোল গোল করে বলে—ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেলো। হঠাৎ কেন জানি না, হাতের পয়সা ছুড়ে জলে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম।

এবারে মেজজেঠী বড়োরকম চমকে ওঠেন।

—চলে এলি? তা'হলে ডুব দেওয়া হয়নি? ও মা, আমি কোথায় যাবো গো?

আর তুই এসে আমার চৌকীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিস? সেই "মাংস খাওয়া" হয়ে আছিস্। হায় হায়, আমি এখন ওই কাঁড়ি বিছানা কি করে কাচি গো!

—বিছানা আমি ছুঁইনি মেজজেঠী!

—না ছুঁসনি! আর যদি বা না ছুঁলি, তোর হাওয়া লাগেনি ওতে?...ওমা ওমা, ওদিকে ওকি সর্ব্বনাশ করলো! মাথাটা খেলো আমার! অ ট্যাঁপা দেখ্, গয়লা মুখপোড়া দুধের বালতী এনে কোথায় নাবালো!...হায় হায়, এবার দেখছি আমাকে কাশীবাসী হ'তে হবে।...অ হতভাগা উজবুক—

খড়ম খটখটিয়ে গয়লার দিকে ধাবিত হন মেজজেঠী!

ট্যাঁপা গয়লার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি হেনে চলে যায়।

যাক্, ওর কৃপায় খুব ফাঁড়াটা কেটেছে!

মেজজেঠীর জেরার মুখে পড়লে কি আর ওই 'গঙ্গার ডাকের' গল্প টিকতো? জেরার চোটে ঠিক আদায় করে ছাড়তেন! পাঁচসিকে পয়সা বন্ধুর কাছে দিয়ে এসেছে ট্যাঁপা—'সাগরের ডাক' সিনেমার টিকিট কিনে রাখতে।...কিছুদিন থেকে ভারী চালাক হয়ে গেছেন মেজজেঠী। ভোগা দিয়ে পয়সা আদায় আর চলছে না।

'ফাঁড়া কাটলো'—বলে মনের আনন্দে আবার রাস্তায় বেরোচ্ছিলো ট্যাঁপা, হঠাৎ দরজার কাছে এক সজোর সংঘর্ষ।

বাজার নিয়ে ফিরছিলেন হারুবাবু—হাতে মাছ-তরকারি।

—দেখতে পাস না ব্যাটা নবাবপুত্তুর? কপালে দুটো চোখ নেই? চীৎকার করে ওঠেন হারুবাবু।

ট্যাঁপা কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবে—কপালের ওপর দুটো চোখ সে তো সকলেরই রয়েছে,—কিন্তু মনে পড়িয়ে দিলেই দোষ। উঃ ছোট হয়ে জন্মানো কি যন্ত্রণাকর!

ট্যাঁপার যখন ছেলেপুলে নাতি-পুতি হবে, তখন দেখিয়ে দেবে একবার শাসন করা কাকে বলে! উঠতে ধমক, বসতে ধমক!...আঃ সেদিন কি আর ট্যাঁপার জীবনে আসবে?

শোনো শোনো গল্প শোনো

ইত্যবসরে মাছ-তরকারি হাত থেকে নামিয়ে হারুবাবু হাঁক দেন—সকালে কোথায় গিয়েছিলি রে?

—ইয়ে—গঙ্গা নাইতে।

—বটে? গঙ্গা নাইতে? শুকনো চুলে লম্বা টেরিটি বজায় রইলো কি করে শুনি? জুতো পরে টেরি কেটে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে গঙ্গা নেয়ে এলে তুমি? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছো? খালি আড্ডা, খালি আড্ডা! আবার মিছে কথা!...তোমার এই মিছে কথার শাস্তি হচ্ছে বাড়ীর বাইরে পা দেবে না!...বুঝলে? তিনদিন বাড়ীর বাইরে নয়।

বীর-বিক্রমে চান করতে যান হারুবাবু। তাঁর কথার নড়চড় নেই! ট্যাঁপার চোখে সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে যায়। তিন দিন বাড়ীতে বন্ধ!

'সাগরের ডাকে' সাড়া দেওয়া চলবে না? নিতাই আর অরুণ সাড়ে পাঁচটার সময় টিকিট হাতে সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, ট্যাঁপা যেতে পাবে না? এতো বড়ো গ্রীষ্মের ছুটিটায় ট্যাঁপা মাত্র তিনটি দিন সিনেমা দেখলো! হায়! এতো দুঃখী এ জগতে কে আছে?

লোকেদের বাবা কাকারা কেমন অফিসে চাকরী করে! রবিবার ছাড়া ছুটির বালাই নেই তাঁদের। আর ভাগ্যক্রমে বেচারা ট্যাঁপার বাবাই কিনা স্কুলের মাষ্টার! অর্থাৎ ট্যাঁপার ছুটির সঙ্গে ওঁর ছুটির নিবিড় একাত্মতা!

রাগে দুঃখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো ট্যাঁপা।

খেতে ডাকুন মেজজেঠী, পণ্ট বলে দেবে 'জ্বর হয়েছে'। জ্বরের ছুতো করে না খেয়ে মরবে সে!

শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমই এসে গিয়েছিলো বোধহয়, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো—নিতাইয়ের ডাকে।

—কিরে এখনো ঘুমোচ্ছিস? দশটা বাজে যে!

ট্যাঁপা ধড়মড় করে উঠে বসে বলে—এটা সেকেণ্ড এডিশান! তা'পর?

—তা'পর আর কি? টিকিট কিনে ফিরছি। তোকে খবরটা দিয়ে যাচ্ছি!

—একটা বেচে দিগে যা, আমার যাওয়া হবে না।

—তার মানে?

—মানে শুনবি? শোন্ তবে—

নিতাই ট্যাঁপার প্রাণের বন্ধু, সব কথাই ওকে বলে। গত রাত্তিরের নেমন্তন্ন

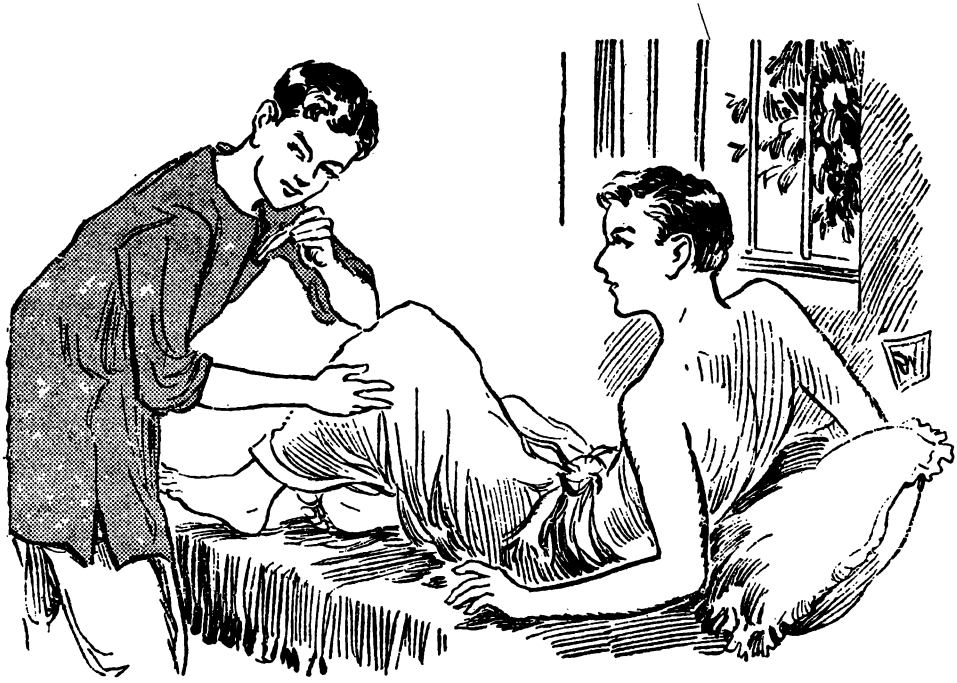

"চল্ ডুবেই মরিগে।"

খাওয়া থেকে সুরু করে বাবার শাসন-প্রণালী পর্য্যন্ত সব বলে বললে—গঙ্গাস্নানের বদলে, ভুলে একবার বন্ধুর বাড়ী গেলে যার ফাঁসির হুকুম হয়, তার গঙ্গায় ডুবে মরাই উচিত কিনা তোরাই বল্?...শুধু শাসন আর শাসন। মেজজেঠী এদিকে ভালো হলে কি হবে, ওই ছুঁৎমার্গ! দূর দূর, যে বাড়ীতে দৈবাৎ একদিন মাংস খেলে পাকস্থলী অপারেশন করে ফেলবার হুকুম হয়, তাদের বাড়ীতে আবার মানুষ থাকে। চল্ ডুবেই মরিগে।

নিতাই গম্ভীর ভাবে বলে—কোন্ বাড়ীতে যে কি আইন, সে যদি জানতিস রে! তবু সকলেই প্রাণটা টিকিয়ে রাখে ভবিষ্যতের আশায়।

ট্যাঁপা মাথার চুলগুলো টানতে টানতে বলে—আমার ভবিষ্যৎই বা কি? বেড়ালে দোষ, খেললে দোষ, কিসে দোষ নয়? বলেছিলাম সাঁতার শিখবো, বাবার মুখ দেখে মনে হলো যেন বলেছি মানুষ খুন করবো!...অথচ রোজ এসে বন্ধুদের বাড়ীর গল্প করেন। কি সব ছেলে তাদের! দেখলে নাকি চোখ জুড়োয়! ফুটবলে কাপ্ পাচ্ছে, সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, দশ বছরের ছেলে তবলা বাজিয়ে মেডেল পাচ্ছে। তার বেলায় দোষ হয় না। কী লগ্নেই যে আমি জন্মেছিলাম!

নিতাই একটু চুপ করে থেকে বলে—এনাদের সব একটু জব্দ করা দরকার।

—কাকে? মানে কাদের?

—এই—আমাদের গার্জেনদের।

—কী করে?

উৎসাহে উঠে বসে ট্যাঁপা।

নিতাই গম্ভীর ভাবে বলে—সে একটু নির্জ্জনে পরামর্শ দরকার। চল্ ছাতে যাই।

—এই রোদ্দুরে?

—তাতে কি? মরতেই যখন চলেছিস!

ঠিক এর দু'দিন পরে হঠাৎ বাড়ীতে হারুবাবুর ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন শোনা গেল। ট্যাঁপা নাকি ভোর বেলা বেরিয়ে গেছে, রাত্তির নটা বেজে গেছে, এখনো আসেনি! ভাত পর্য্যন্ত খায়নি।

মেজজেঠী কিছুক্ষণ লুকিয়ে-চুরিয়ে ঝি-চাকরদের দিয়ে খুঁজিয়েছিলেন, এখন কান্না জুড়ে দিয়েছেন।

হারুবাবু যতো তর্জ্জন করেন—এতো বড়ো আস্পদ্দা? ভেবেছে কি লক্ষ্মীছাড়া পাজীটা। আসুক দেখি কে ওকে বাড়ী ঢুকতে দেয়—

মেজজেঠী ততো কাঁদেন—ও ঠাকুরপো, আমার মন নিচ্ছে—সে আর নাই।

মা গঙ্গা তাকে ডেকেছিলেন, সে বলেছিলো, আমি গ্রাহ্য করিনি। সে নিশ্চয়ই ডুবে মরেছে!

—ডুবে মরেছে! হারুবাবু খেঁই খেঁই করতে থাকেন—তার চৌদ্দপুরুষে কেউ ডুবে মলো না, আর সে তোমার ডুবে মরলো? ডুবে মরা অতো সস্তা নয়।...আড্ডা, আড্ডা, স্রেফ্ আড্ডা! ওই যে অকালকুষ্মাণ্ড চারটি বন্ধু জুটেছে, ওরাই মাথা খেলে!

হারুবাবুর গর্জ্জন প্রথমটা বাড়তে বাড়তে আকাশে ওঠে...কিন্তু ক্রমশঃ যখন রাত গভীর হয়, তখন কেমন কমতে থাকে! শেষ অবধি খানিকটা গুম্ হয়ে বসে থেকে রাত্তির একটার সময় ছোটেন—থানায় থানায় আর হাসপাতালে হাসপাতালে ফোন করতে।

পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, চাকরটাকে তার বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী পাঠান; কিন্তু না, ট্যাঁপার পাত্তা নেই!

এইবার মেজজেঠী ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন।

আর হারুবাবু ভয়াবহ চেহারা নিয়ে বাইরের রোয়াকে বসে থাকেন।

আজ প্রথম মনে পড়ে জীবনে তিনি কোনোদিন ছেলেটাকে ভালো কথা বলেননি, একটু কাছে-পিঠে করেননি। মা-মরা ছেলেকে বাপ কতো স্নেহ করেন! হায়! হায়! কেন এমন রাক্ষুসে স্বভাব তাঁর?...হে ভগবান, এবারটা যদি ভালোয় ভালোয় পাওয়া যায় তো বাকী জীবনটা দেখিয়ে দেবেন তিনি পিতৃস্নেহ কাকে বলে!

ওদিকে মেজজেঠী? কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা বিলাপ করছেন তার সার-মর্ম্ম এই—ট্যাঁপা, তুই ফিরে আয়, আমি তোকে আর কোনোদিন 'চান করা' 'কাপড় ছাড়া' নিয়ে, গোবর-গঙ্গাজলের ছায়া মাড়াতে দেবো না! তুই মুরগী শুয়োর যা প্রাণ চায় খেয়ে দেয়ে শুধু প্রাণে বেঁচে থাক্।...ইত্যাদি...ইত্যাদি...।

কিন্তু হায়! যার জন্যে এতো কাণ্ড, সে ট্যাঁপা কই?

ক্রমে সকাল হলো...খোঁজার পালা আরও বাড়লো, আবার থানায় থানায় হাসপাতালে হাসপাতালে ফোন।

সকাল গেলো, দুপুরও যায় যায়...এমন সময় নিতাইয়ের আবির্ভাব।

—কাকাবাবু!

চমকে তাকান হারুবাবু।...এই সেই অকালকুষ্মাণ্ডের একটা কুষ্মাণ্ড না? কিন্তু আজ আর একে দেখে দুই চোখে অগ্নিবাণ বর্ষণ নয়। পরম স্নেহে ছুটে আসেন হারুবাবু।

—কে? ট্যাঁপার বন্ধু না তুমি? এসো বাবা!...তোমাদের বন্ধু আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে বুঝি!

প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন ভদ্রলোক।

নিতাই করুণ কণ্ঠে বলে—কাকাবাবু, তরুণ বলছিলো—ওর জামাইবাবু নাকি বলছিলো ট্যাঁপার মতো কাকে দেখেছে।

—অ্যাঁ অ্যাঁ! কে দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

—তরুণের জামাই বাবু! দক্ষিণেশ্বরে থাকেন কি না, আজ এসেছেন। বলছেন ট্যাঁপার মতো কাকে না কি মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে থাকতে দেখেছেন সকালে!

—দেখেছে? আমার ট্যাঁপাকে দেখেছে? সে চেনে আমার ট্যাঁপা মানিককে!

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা!"
[পৃঃ—১৭৩

নিতাই কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছতে থাকে! মোছা আর শেষ হতে চায় না, একটু পরে মুখ গম্ভীর করে বলে—কবে যেন একদিন দেখেছিলেন! আমি অবিশ্যি তেমন বিশ্বাস করিনি, তবে বলছিলাম যদিই পাওয়া যায়—

—তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক বাবা—দাঁড়াও তুমি একটু। যদি তোমাদের কথায় ফেরে! বাড়ীতে ওর জেঠীকে বলে আসি—

শুনে মেজজেঠী চীৎকার করে উঠলেন—ও ঠাকুরপো, আমিও যাবো। আমি তাকে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসবো। তার যা প্রাণ চায়, করুক। সে আমার অভিমান করে চলে গেছে।

—জানি না খবর সত্যি কিনা! তবু—যাবে তো চলো।

ট্যাক্সী-ড্রাইভারকে নোটের গোছা ধরে দিতে হবে। তা'হোক, তবু তো তাড়াতাড়ি যাওয়া হবে।...ট্যাক্সী একখানা ভাড়া করে ছুটলেন—হারুবাবু, মেজজেঠী, নিতাই আর তরুণ।

—কোথায় দেখেছে বলেছিলো? হ্যাঁ বাবা ইয়ে?

—ওই যে পঞ্চবটীর কাছে না কি! চলুন না!

—হে ভগবান্, মুখ তুলে চেও। হে মা কালী, তোমায় ষোলো আনা পুজো দিয়ে যাবো—বলতে বলতে চলেন মেজজেঠী।

হ্যাঁ, ভগবান মুখ তুলে চান।

মা কালীর বোধহয় ষোলো আনা পুজোর লোভ প্রবল হয়ে ওঠে।...পঞ্চবটীর বাঁধানো তলায় বসে থাকতে দেখা গেলো ট্যাঁপাকে।...

কিন্তু সে কি ট্যাঁপা?

তাকে কি ট্যাঁপা বলে চিনতে পারা যাচ্ছে?

গায়ে ভস্ম মাখা, পরণে গেরুয়া। মুখে উদাস ভাব, চক্ষু মুদ্রিত।

হারুবাবু সামনে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ান।

নিতাই আর তরুণ পিছনে দাঁড়িয়ে নিজেরা ঠেলাঠেলি করতে থাকে, মেজজেঠী নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকেন সত্যিই ট্যাঁপা কি না!

তারপর?

তারপর এক কর্ণ-বিদারী বজ্র-নির্ঘোষ। ট্যাঁপা! হতভাগা ষ্টুপিড্! বাঁদর, গাধা, জেব্রা, জিরাফ! ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

কানের টানে সোজা উঠে দাঁড়াতে হয় ট্যাঁপাকে! সত্যি ট্যাঁপার কানটা হারু-বাবুর হাতে থেকে যাবে, ট্যাঁপা তবুও বসে থাকবে, এটা তো সম্ভব নয়?

—বাড়ী চলো নদের চাঁদ, দেখো তোমায় কি করি! চল্ বলছি—চল্ শীগ্‌গির!

হঠাৎ হারুবাবুর গলার স্বর ছাপিয়ে ভাঙা কাঁসরের বাদ্যি বেজে ওঠে—'চল্ শীগ্‌গির' মানে? দুম্ করে গেলেই হলো? আমার সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে হবে না?...কাল থেকে বাড়ীছাড়া হয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরছে, কি মাড়িয়েছে, কি ছুঁয়েছে, তার ঠিক কি?...গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে চলুক!...আয় আমার সঙ্গে লক্ষ্মী-ছাড়া বাঁদর! আবার গেরুয়া পরে সঙ্ সাজা হয়েছে!

বাবার হাত থেকে জেঠীর হাতে কানটা ট্র্যান্সফার হয়ে যায়।

খড়ম খট্‌খটিয়ে আগে এগিয়ে চলেন মেজজেঠী সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঁপা। ভাগ্যক্রমে এটা অন্যদিকের কান, তাই রক্ষে, নইলে হয়তো—শুধু কানটাই মেজজেঠীর হাতে চড়ে গঙ্গাস্নানে যেতো।...ট্যাঁপা দাঁড়িয়ে পড়তো।

বন্ধুরা? তারা অনেকক্ষণ হাওয়া।

ট্যাক্সী চড়ে বাড়ী ফেরবার সুখে আর দরকার নেই তাদের!

ব্রতভঙ্গ

রাত্রের ট্রেণে হরিদ্বার থেকে মথুরায় আসছিলেন স্বামী সত্যানন্দ। যদিও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তবুও বাজে লোকসঙ্গর ভয়ে সর্ব্বদাই ট্রেণের ফার্ষ্ট ক্লাশে যাওয়া-আসা করেন স্বামীজী!

অর্থের অভাব নেই, ভক্তরা অযাচিতভাবে ঢেলে দেয়। দিয়ে ধন্য হয়। ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসী!

মূল আশ্রম হরিদ্বারে; দ্বিতীয়টি মথুরায়। এ ছাড়াও সারা ভারতে ছড়ানো আছে ছোট বড়ো অনেক শাখা আশ্রম। পালা করে প্রত্যেক জায়গাতেই দু'দশদিন করে থাকতে হয় তাঁকে।

কামরাটা একেবারে জনশূন্য।

আলো নিভিয়ে দিয়ে জানলার ধারে বসে ছুটন্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু ভজন গান করছিলেন স্বামীজী, রাত বাড়তেই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

হয়তো তন্দ্রা এসেছিলো...হয়তো আসেনি, অভ্যাসমতো ঘুমের আগে ঈশ্বর-চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ মনে হলো—কে যেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে!

শোনো শোনো গল্প শোনো

নিঃশব্দে চোখ খুলে একটু তাকাতেই বুঝলেন—ছায়ামূর্ত্তির মতো কে একজন ওঁর মাথার কাছে-রাখা ব্যাগটা খোলবার চেষ্টা করছে।

চাবি-বন্ধ গাড়ীতে কোথা থেকে এলো লোকটা? আশ্চর্য্য তো!

কে জানে হয়তো গাড়ী ছাড়বার আগে থেকেই বাথরুমে লুকিয়েছিলো, কিংবা 'আপার বার্থে' উঠে এমনভাবে বসেছিলো হঠাৎ কারো নজরে না পড়ে।

চোর, তা'তে আর সন্দেহ কি?

অন্ধকারে চুপিসাড়ে নিঃশব্দে অন্যের ব্যাগ খোলবার চেষ্টাটা নিশ্চয়ই সাধুতার লক্ষণ নয়!

স্বামীজী অন্ধকারেই মৃদু হেসে বললেন—বৃথা কষ্ট করছো। বাবা, মজুরি পোষাবে না।

লোকটা গলার একটা অস্ফুট আওয়াজ করে খানিকটা সরে গেলো।

স্বামীজী উঠে আলোটা জেবলে ফেললেন।

রোগা পাকসিটে একটা বছর তেইশ-চব্বিশের ছোকরা।

রংটা ফর্সা, চুলগুলো ঝাঁকড়া, ভুরুর ওপর প্রকাণ্ড একটা কাটার দাগ। মুখের চেহারা হয়তো ভালোই ছিলো, কিন্তু বসন্তের দাগে কেমন শ্রীহীন। পকেটে হাত রেখে উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো বা পকেটে লুকোনো রিভলবারটা মুঠো করে।

স্বামীজী শান্তভাবে আর একটু হেসে বলেন—ভুল গাড়ীতে উঠে পড়েছো বাবা, তোমার যা' দরকার তা' তো এখানে মিলবে না।

ছোকরার হাতে রিভলবার বলেই হয়তো বুকের পাটা বেশী, তাই স্বামীজীর কথায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ সন্নিসী ব্যাটাদের খুব জানা আছে আমার! গেরুয়া পরলেই সর্ব্বত্যাগী হয় না, তোমাদের মতন মোহন্তগুলো তো এক-একটি টাকার কুমীর! হাঁদারাম শিষ্যিগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে কম টাকাটি বাগাও তোমরা? খবর পেয়েছি বহুৎ টাকা সঙ্গে আছে তোমার।

.....নিন, বলে যাচ্ছি—লিখে নিন গুছিয়ে।.....

ছোকরার বলার ধরনে অপমান বোধ না করে ভারী কৌতুক অনুভব করেন সত্যানন্দ। তেমনি হাসিমুখেই বলেন—তবে আর দেরী কেন? অস্তরটা পকেট থেকে বার করে ফেলো! শীতের রাত, ধরা পড়বার ভয় কম, নেক্স্ট স্টেশনে নেমে পড়ো।

ছোকরার চোখের উদ্ধত ভাবটা বদলে বিদ্রূপের ভাব ফুটে ওঠে। পকেটের রিভলবার হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বলে—হুঁঃ বুড়ো ঘুঘু কম চালাক নও তুমি! মনে করেছো লম্বা লম্বা বোলচাল মেরে ঘাবড়ে দেবে, কেমন? কথার ভাবে জানাতে চাইছো, যেন আধলার ফকির! এদিকে ফাস্টোকেলাশ-গাড়ীতে ভিন্ন চড়া হয় না, সিল্কের গেরুয়া নইলে অঙ্গে ওঠে না, তোমাদের মতন সাধুকে চিনতে আর বাকী নেই!...সন্নিসি হবে 'নাঙ্গা বাবা'! গাঁজা-ভাঙ্ টানবে, পায়ে হেঁটে তীর্থি-ধম্ম করবে, এই তো জানি।

সত্যানন্দ যেন একটা মজার খেলা পেয়ে গেছেন, তাই স্বভাবগত গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করে ওর কথার ধরন নিয়েই বলেন—সবাই কি ঠিক উচিতমতো চলতে পারে বাবা? এই, তোমার কথাই ধর না, ভদ্রঘরের ছেলে—মানুষ হবে, ভদ্র হবে, এই তো রীতি! রাত্রের ট্রেণে রিভলবার হাতে ঘুরে বেড়াবার কথা তো তোমার নয়?

—ওঃ ভদ্দর!

ছোকরা নাক কুঁচকে বলে—ওসব কথা অনেকদিন ভুলে গেছি। ছেঁদো কথা রেখে ব্যাগটি খোলো দিকিন!

—তুমিই খোলো না—বলে সত্যানন্দ ব্যাগটি তুলে ওর দিকে ঠেলে দেন।

ছেলেটা এবারে যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ে, তবু—মুখে একটু জোরের ভাব ফুলিয়ে বলে—এঃ বুজরুকি দেখো! ট্যাঁকে টাকা রেখে, ব্যাগ এগিয়ে বাহাদুরী দেখাচ্ছে! রামদীন শয়তান কি আমায় মিথ্যে খবর দিয়েছে নাকি? নীট্ খবর জেনেই বলেছে—'বুড়ো ঘুঘুর পেছনে লাগ্, অনেক টাকা আছে ওর সঙ্গে...মথুরার মঠ সারাতে যাচ্ছে, দশ বিশ হাজার কি আর না আছে—'

সত্যানন্দ এবারে একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—যারা এতো খবর জোগাড় করেছে,

তাদের এটুকু বুদ্ধি হয়নি বাবা, দশ বিশ হাজার টাকার থলি নিয়ে রাত্রের ট্রেণে একা বুড়োমানুষ চলাফেরা করে না?

ছোকরা এবারে যেন পুরো হতাশ হয়ে বলে—তাই ভাবছি, আমিও যেমন একটা গবেট্! বলি 'চেকে'র খাতা-টাতা সঙ্গে আছে?

স্বামীজী মাথা নেড়ে বলেন—নিজের চোখে দেখেই নাও না?

—নাঃ, মরুকগে! ও ছাই দুখানা গেরুয়া আলখাল্লা নেড়ে আর কাজ নেই আমার! কিন্তু এই বলে রাখছি—যেমন আছো তেমনি থাকো চুপচাপ! চেন্-ফেন্ টানতে গিয়েছো কি ফর্সা হয়ে গেছো! সন্নিসীগিরি ঘুচে যাবে জন্মের মতো!

স্বামীজী আর কিছু না বলে, স্নিগ্ধ হাসিমুখে ফের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আগের মতো কম্বলটা ঠিক করে শুয়ে পড়েন। আর...কিছুক্ষণ পরেই তাঁর নিশ্চিন্ত নিদ্রার একটানা শান্ত নিঃশ্বাসের ছন্দ ধ্বনিত হতে থাকে ট্রেণের কামরায়!...

ছোকরা অন্ধকারে নিথর বসে বসে কী ভাবতে থাকে কে জানে?

দস্যু রত্নাকরের মতো পরিবর্ত্তন আসছে কি তার?

কে জানে আসতো কিনা।

কে জানে প্রায় ঘণ্টাখানেক কি ভাবে কাটিয়েছে সে, হঠাৎ এক সময় দু'হাতে পেট চেপে ধরে ডুকরে চীৎকার করে ওঠে—ওরে বাবা শয়তান সন্নিসি! শুয়ে শুয়ে কী বিষমন্তর ঝাড়লি? গেলাম যে—একেবারে গেলাম। উঃ হুঃ হুঃ!

সত্যানন্দ উঠে পড়ে ব্যস্ত হয়ে বলেন—কি হলো?

ছোকরা বসন্তে-বিকৃত মুখখানা আরো বীভৎস করে বলে ওঠে—নিজে বিষমন্তর ঝেড়ে আবার বলা হচ্ছে—'কি হলো'। ওরে বাবারে, গেলাম!...যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে ছেলেটা—জানোয়ারের মতো কুৎসিত কর্কশ গলায়।

সত্যানন্দ মিনিটখানেক ওর যন্ত্রণার ধরন লক্ষ্য করে বলেন—এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ আছে তোমার?

—কী? কী বললে?

ছোকরা সেই যন্ত্রণার মধ্যেও যেন মারতে ওঠে—কী বললে শুনি একবার? 'গুষ্ঠির পিণ্ডি' আছে কিনা আমার? রাজপুত্তুরের অবস্থা দেখছো, কেমন? তাই সাত বেলা ডাক্তার দেখিয়ে দেখিয়ে জেনে রেখেছি—ভেতরে পিণ্ডি আছে কি মুণ্ডু আছে!...তিন তিনটে ওয়ারেণ্ট মাথার ওপর ঝুলছে, বুঝলে? দুটো চুরির, একটা খুন জখমের! ডাক্তার দেখাতে যাই, আর—ক্যাঁক্ করে ধরে নিয়ে যাক।...ওরে বাবারে বাবাঃ। আর বাঁচবো নাঃ!...আর বাঁচবো না!

উপুড় হয়ে পড়ে মুখবাঁধা জন্তুর মতো আর্ত্তনাদ করতে থাকে ছেলেটা।

স্বামীজী ওর যন্ত্রণায় গোল-হয়ে-যাওয়া দেহটার ওপর হাত বুলিয়ে দেবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে কাতরভাবে বলেন—একটু স্থির হও বাবা,—একটু শান্ত হও, পরের স্টেশন এলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

ছোকরা গোঙায় তবু স্বভাব ছাড়ে না।

তার মধ্যেই কটু কণ্ঠে বলে—ব্যবস্থা মানে তো রেল-হাঁসপাতালের খোঁয়াড়ে দেওয়া?...যাবো না আমি। কক্খনো না! ওরা বাঁচিয়ে তুলে ফাঁসি দেবে!...তুমি তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো আমায়।...দোহাই তোমার, মুটে দিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিও বরং তাও ভালো। হাঁসপাতালে দিও না।

—কিন্তু আমার নিজের জায়গায় পেঁছিতে যে এখনো অনেক দেরী!

—তা হোক! তা হোক!...হাঁফাতে থাকে ছেলেটা—বিষমন্তর জানো আর ভালো মন্তর জানো না? তাই লাগাও না একটু!

সত্যানন্দ বিষণ্ণ একটু হেসে বলেন—বিষ অমৃত কোনো মন্তরই জানি না বাবা, হঠাৎ এরকম হলে চিকিৎসার দরকার তাই জানি।

—হঠাৎ নয় গো, হঠাৎ নয়, হয় মাঝে মাঝে, এবারেই সাংঘাতিক! মরে যাবো আমি, নিশ্চয় মরে যাবো, তোমার পায়ে পড়ি সন্নিসি ঠাকুর, বাঁচাও আমায়—হাঁসপাতালে ফেলে দিও না—

হঠাৎ একটা মোচড় খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ছেলেটা।

মন্দের ভালো!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরকম যমযন্ত্রণা দেখা কী ভয়ঙ্কর! থাকুক দু'-দণ্ড অজ্ঞান হয়ে।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সত্যানন্দ!...

হাঁসপাতালে দেবেন না? সত্যি সত্যি ঘাড়ে করে নিয়ে যাবেন নিজের আশ্রমে? কিন্তু কেন?

কেন এতো বড়ো ঝুঁকিটা নেবেন? কি দরকার?...

হাঁসপাতালেই দিয়ে দেবেন পরের স্টেশনে?...অচৈতন্য মানুষটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন?...কিন্তু ওর সঙ্গে বিশ্বাসের কথাই বা কি? একটা ফেরারী খুনী আসামী, সুযোগ পেলে তাঁকেও হয় তো খুন করে ফেলতো এতোক্ষণ।

তবে?

বেঁচে উঠলে ফাঁসি হবে?

তা'তেই বা ক্ষতি কি? সমাজের শত্রু, মানুষের শত্রু, শান্তির শত্রু। এদের তো শাস্তি হওয়াই প্রয়োজন।

তবু—কোথায় যেন কি বাধে।—

মন থেকে সায় আসে না কিছুতেই।...স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যায়, রাত কেটে ভোর হয়ে আসে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন সত্যানন্দ। নাঃ, নিজের আশ্রমেই নিয়ে গিয়ে তুলবেন।—

ব্যাকুল সন্ন্যাসী নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও সময় হবার আগেই বার বার জানলার বাইরে তাকান, কখন আসবে নিজের গন্তব্যস্থল।

অবশেষে আসে!

স্টেশন লোকে লোকারণ্য। প্রতীক্ষারত অসংখ্য ভক্তের দল।

স্বামীজী আসছেন! প্রায় দু'বছর পরে।...চারিদিকে খবর রটে গেছে।

প্রথমেই বিনা কৈফিয়তে একটা স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত করতে বলেন স্বামী সত্যানন্দ।

ভক্তবৃন্দ থেকে রেলকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত সব তটস্থ।—

কেউ কোনো প্রশ্ন করে না... নিশ্চয় স্বামীজীর কোনো প্রিয় পাত্র, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

শহর তোলপাড় করে এলো ডাক্তার। হলো যথাসম্ভব চেষ্টা, কিন্তু অসম্ভব কি সম্ভব হয়? একবার যে মৃত্যুর থাবার মধ্যে পড়ে গেছে, তাকে ছাড়িয়ে আনবার ক্ষমতা কোন বৈদ্যের আছে?

স্বামীজীর নির্ণীত রোগই বটে, অত্যাচারে অনাচারে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরে চলে গেছে ছেলেটা।

আশ্রমের সেবাব্রতী কর্ম্মী-দের বহু চেষ্টা ব্যর্থ করে, পরদিন ভোরের দিকে মারা গেলো ছেলেটা।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ছেলেটা সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না কেউ, কৌতূহল আশ্রমের নীতিবহির্ভূত!

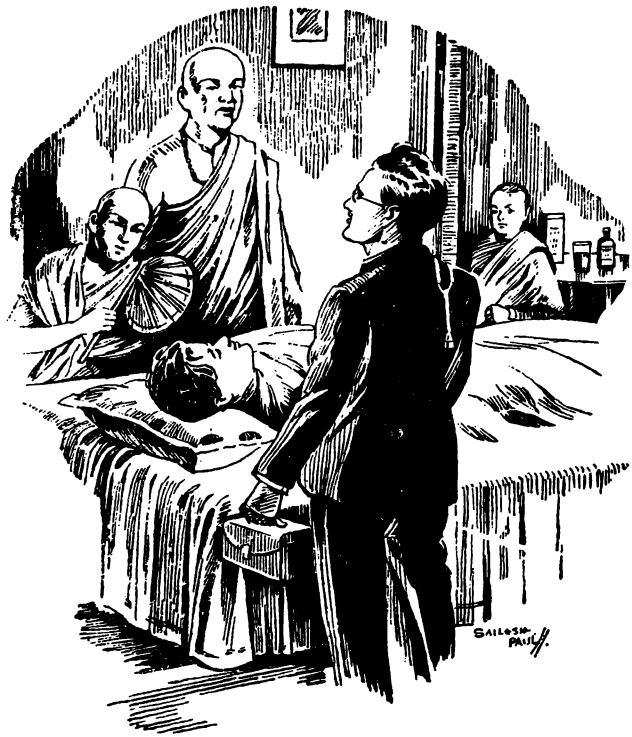

শহর তোলপাড় করে এলো ডাক্তার।

যে যার যথাকর্ত্তব্য সেরে যায়।

আর ওরই মধ্যে একজন এসে স্তব্ধ সত্যানন্দর হাতে দিয়ে যায় একটা মোটা কাগজের খাম।

ছোকরার জামার ভেতর দিকে নাকি কৌশলে সেলাই করা ছিলো।

খান ছয়েক দশ টাকার আর পাঁচখানা একশো টাকার নোট!

এ টাকা নিয়ে কি করবেন স্বামীজী!

টাকাগুলো হাতে নিয়ে এ টাকা কোন্ অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন হয়েছে, সে কথা ভাবছিলেন না সত্যানন্দ, ভাবছিলেন এতোগুলো টাকা পকেটে নিয়ে—একটা মারাত্মক রোগে এক ফোঁটা চিকিৎসা করেনি ছেলেটা।...

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার ভয়ে গ্রেপ্তার হলো যমের হাতে।

কিন্তু টাকার কি হবে?

কোনো সৎকাজে দিয়ে দেবেন সত্যানন্দ?

কোন্ অধিকারে?...কে বলতে পারে কেন ও নেমেছিলো এই পাপের পথে, মৃত্যুর পথে! হয়তো এই ভাবে উপার্জ্জন করেই সংসার চালাতে হ'তো তাকে, পাঠাতে হতো দুঃস্থ বাপ মাকে।

কে বলে দেবে ওর নাম কি ছিলো, কি ছিলো ঠিকানা!

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়ে দেন—একথা সত্যি।

হঠাৎ খামের কোণ থেকে পড়ে একটুকরো ছোট্ট কাগজ। চিঠি নয়, ঠিকানা নয়, একটুকরো খবরের কাগজের কাটিং!

মলিন বিবর্ণ বহু পুরনো।

নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন!

পুরস্কার ঘোষণা নয়, কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন।

"আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার রায়, বয়েস কুড়ি, রং ফর্সা, মুখে বসন্তের চিহ্ন, কপালে কাটার দাগ, গত ১৩ই পৌষ হাওড়া স্টেশন হইতে হারাইয়া গিয়াছে। যদি কোনো মহাশয় ব্যক্তি সন্ধান দিতে পারেন, অভাগিনী মাতা চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

—কিরণশশী দেবী

পোঃ রতনপুর, জেলা বর্দ্ধমান"

বয়েস কুড়ি!

বছর চারেক হয়ে গেছে সন্দেহ নেই।...কাটিংটার চেহারাও তাই বলছে।

পরদিন ভক্তদের ডেকে বলে দিলেন বর্দ্ধমানে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে। একা যাবেন।

বর্দ্ধমানে!

সেখানে কি?

নতুন আশ্রম-টাশ্রম স্থাপনের বাসনা নাকি? তীর্থ নয়, ধর্ম্মের স্থান নয়!

কিন্তু প্রশ্ন করবে কে?

রতনপুর! সে তো টিকিট কিনলেই এসে পেঁছনো যায়। কিন্তু—

রতনপুর স্টেশনে নামলেই কি কিরণশশী দেবীকে পাওয়া যাবে?

যায়—পোস্ট অফিসে খোঁজ করলে।

ছোট্ট গ্রামে এমন একজন সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব! যে দেখে সেই আটকে পড়ে! ব্যস্ত তটস্থ জোড়হস্ত।

শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের পিয়নই বললে—জানি বাবা। ডেকে আনবো?...আহা, একমাত্তর ছেলেটা হারিয়ে গিয়ে পর্য্যন্ত বিধবা মেয়ে মানুষটার যে দশা! কোথাও নড়ে না। সে আপনার নাম করলে আসবে অখন। যাচ্ছি—

—ডাকতে হবে না, আমাকেই নিয়ে চলো।

একা যাবার ইচ্ছে থাকলেও কৌতূহলী গ্রামবাসী সে ইচ্ছে পূরণ করতে দেবে না—জানা কথা। মারলেও না। সবাই যায় পিছন পিছন।

বিধবা, দুঃখীর চরম কিরণশশী অবাক হয়ে বেরিয়ে আসেন।

তাঁকে আবার কার দরকার?

সত্যানন্দ ওঁর সামনে কাগজের টুকরাটুকু ধরে বলেন—এ বিজ্ঞাপন আপনার দেওয়া?

কিরণশশী হতাশ ব্যাকুল দৃষ্টিতে বলেন—হ্যাঁ বাবা, তার কোনো সন্ধান পেয়েছেন? আজ চার বছর ধরে—বেঁচে আছে তো বাবা? আসবে?

—আসবে না।—গম্ভীর স্থির স্বরে উচ্চারণ করেন স্বামী সত্যানন্দ—আসবে না, সেই কথাই বলতে আসতে হলো আমায়। সে সন্ন্যাস নিয়েছে।

—সন্ন্যাস!

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন কিরণশশী, বোধহয় ছেলের স্বভাবের সঙ্গে ব্যাপারটা খাপ খাওয়াতে পারেন না। অবশেষে কাতর ভাবে বলে ওঠেন—আপনার কাছে বাবা?

—হ্যাঁ! এই টাকা ছিলো তার সঙ্গে, সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নিষেধ। এ টাকা আপনার প্রাপ্য।

টাকা!

এতো টাকা!

বিধবা কিরণশশীর কাছে যা ঐশ্বর্য্য!

এ বিজ্ঞাপন আপনার দেওয়া?

কিন্তু ছেলের চাইতে কি টাকা?

হঠাৎ কিরণশশী ডুকরে কেঁদে ওঠেন—রোজগারের জন্যে গঞ্জনা দিয়ে তাড়িয়েছিলাম বলেই বুঝি মায়ের ওপর শোধ নিয়েছে সে। টাকা আমার চাই না বাবা একবার খালি শুধু তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।—একবার মাপ চেয়ে নিই।

সত্যানন্দ স্নিগ্ধ স্বরে বলেন—তা হয় না মা, দীক্ষিত সন্ন্যাসীর বারো বছরের মধ্যে, জননী আর জন্মভূমি দর্শন নিষিদ্ধ!

বারো বছর!

ট্রেণের কামরায় বসে ভাবতে থাকেন সত্যানন্দ। আরো—বারো বছর ধরে কি বেঁচে থাকবে কিরণশশী? তারপরেও হিসেব নিতে চাইবে এই প্রচণ্ড মিথ্যে কথার?

কিন্তু সত্যানন্দ এ-রকম করলেন কেন?

মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গেই তো টাকাটা দিতে এসেছিলেন তিনি!—মনি অর্ডার করেননি শুধু—চার বছর ধরে একমাত্র সন্তানের বিরহ সহ্য করে কিরণশশী বেঁচে আছে কি না—সেই সন্দেহে।

শত লোকের সামনে পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলে এলেন স্বামী সত্যানন্দ। ত্রিশ বছর আগে গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে ব্রত নিয়েছিলেন,—ত্রিশ বছর ধরে যে ব্রত পালন করে আসছেন—সেই ব্রত ভঙ্গ করে!

কিন্তু কেন?

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্য

বজ্রশীল বাজপেয়ী নিজের ফ্ল্যাটে এসে হাঁপাতে শুরু করলেন।

কি ভাবছো?

নামটা বাজখাঁই গোছের হ'লেও লোকটা বোধহয় ফড়িঙের জ্ঞাতি-ভাই? নামের সঙ্গে চেহারার মিল কারই বা থাকে? তাই না? কাজেই তোমরা ভাবতে পারো—লোকটা হয়তো শিঙিমাছের ঝোল-ভাত খায় আর দু'পা হাঁটলেই হাঁপায়।

কিন্তু মোটেই তা নয়।

বজ্রশীলবাবু আমাদের সার্থকনামা ব্যক্তি।

তাঁর ভোরবেলার 'বালভোগ' হচ্ছে—তিন পোয়া ছোলা ভিজে, এক পোয়া গুড়; আর দু'আনার আদা। এইগুলি ভোগ লাগিয়ে তবে তিনি ব্যায়াম আরম্ভ করেন।...ঘণ্টাতিনেক ধরে—"হৃৎকম্প যোগ", "নাভিশ্বাস যোগ", আর "লৌহ-মুদ্গর যোগ" সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্রাতরাশ।

আটটা ডিম, এক ডজন টোষ্ট, আড়াই ছটাক মাখন, আধকুড়ি আলুসিদ্ধ। এই। এটুকু তাঁর চাই-ই।

আর হাঁপানো?

দু-মাইল একটানা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লেও না।

তবে?

আজকের হাঁপানোর কারণ?

আজকের কারণ হচ্ছে মানসিক উত্তেজনা। রীতিমত উত্তেজনা।

এইমাত্র তিনি তাঁর পরমবন্ধু কানাইবাবুকে ঠেঙিয়ে আধমরা ক'রে এসেছেন! কোনোকিছুতেই আধাআধিতে সন্তুষ্ট তিনি হন না, পুরোই ক'রে ছাড়েন, এ যাত্রা কানাইবাবুর প্রাণটা রক্ষে হয়ে গেলো ভদ্রলোকের পিসিমার দৌলতে।

কানাইবাবুকে আগলাতে এলেন তিনি।

রাগলে বজ্রশীলের জ্ঞান থাকে না সত্যি, তা ব'লে মহিলার গায়ে চড়টা-চাপড়টা প'ড়ে যাবে, এতো অজ্ঞান তো নন। তাই বাধ্য হয়েই আধমরা কানাইবাবুকে ছেড়ে দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এসে হাঁপাতে শুরু করলেন!

অথচ কানাইবাবু তাঁর প্রাণের বন্ধু।

অন্ততঃ আশ-পাশের লোকের তো তাই ধারণা।

ধারণা হবে না-ই বা কেন? হবার কারণও যথেষ্ট আছে।

প্রত্যেক দিন সকালে অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা দেখতে পায় প্যাঁকাটির মতো দু-খানি হাতে প্রকাণ্ড একটা টিফিন-ক্যারিয়ার উঁচু ক'রে বয়ে নিয়ে কানাইবাবু খুটখুটিয়ে চলেছেন নিজের ফ্ল্যাট থেকে বজ্রশীলের ফ্ল্যাটে। আবার কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যায় সেইটাই একহাতে দোলাতে-দোলাতে উদাসভাবে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরছেন কানাইবাবু।

এর অর্থ কি?

কি 'বয়ে' নিয়ে যায় লোকে টিফিন-ক্যারিয়ারে?

দোলাতে-দোলাতে ফেরার মানেই বা কি? কি হতে পারে? টিফিন-ক্যারিয়ারের পূর্ণ গহ্বর বজ্রশীলের শূন্য জঠরে উজাড় ক'রে দিয়ে আসা ছাড়া?

প্রাণের বন্ধু না হ'লে কি ক'রে এতোটা সম্ভব?

অবশ্য ভেতরের নীট্ খবর কেউই জানে না।

কানাইবাবুকে প্রশ্ন করলে তিনি একটু অমায়িক হাসি হেসে বলেন—যেতে দিন, দাদা, ওসব কথা যেতে দিন।

আর বজ্রশীলকে?

কে জিজ্ঞেস করতে যাবে তাঁকে? গোঁফে 'তা' দিয়ে-দিয়ে আর মাস্‌ল্ ফুলিয়ে-ফুলিয়ে বেড়ানো দেখলেই তো লোকের হাড়পিত্তি জ্ব'লে যায়। ডেকে কথা কইতে ইচ্ছেই হয় না।

ভেতরের খবর কে কার জানতে পারে বলো—একমাত্র কলমধারী ছাড়া?

হাসছো নাকি? হেসো না। ঠিকই বলছি—বংশীধারীর বাঁশীর মতো, কলমধারীর কলমেরও অনেক গুণ। কলম হাতে করলেই দেখবে সবজান্তা হয়ে গেছো তুমি। তখন—জলে-স্থলে আকাশে-অন্তরীক্ষে অন্ধকারে কি বন্ধ করে যে যা করছে—তো বটেই, যে যা ভাবছে—তারও কিচ্ছুই আর অজানা থাকবে না তোমার।

আপাততঃ আমার হাতে কলম, তাই ভেতরের কথাটা জানিয়ে দিই তোমাদের।

কানাইবাবু এ বাড়ীতে অনেকদিন আছেন। বজ্রশীল যখন নতুন এলেন, তিনি ওপর-পড়া হয়ে এলেন দেখা করতে।...বজ্রশীল তখন তেল মাখতে বসেছেন। কানাইবাবুও স্নানের ঘরের যাত্রী—খালি গা, কাঁধে তোয়ালে।

মিনিট কতক হাঁ ক'রে বজ্রশীলের তেলমাখার তরিবতের দিকে তাকিয়ে থেকে কানাইবাবু ফোঁস ক'রে একটী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আসতে আসতেই দাদার নামটা শুনে ফেলেছি। হুঁ সার্থকনামা বটে। আপনাদের মতো লোক পাড়ার একটা ভরসা!...আসবো দাদা আলাপ করতে।

এই প্রথম দিন!

তারপরে কানাইবাবু এলেন একদিন আলাপ করতে।

শোনো শোনো গল্প শোনো

বজ্রশীল তখন প্রাতরাশে বসেছেন!...আদা-ছোলা-পর্ব্ব নয়, ডিম্ব-পর্ব্ব।... কানাইবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক—এই যে আসুন আসুন, ওরে মাধব আর এক পেয়ালা চা, আর—

শুনে কানাইবাবু সাপ দেখার মতো চমকে ওঠেন।

—সর্ব্বনাশ! মুখে আনবেন না, মশাই, ওকথা মুখে আনবেন না।

বজ্রশীল অবাক্ হয়ে বলেন—কেন বলুন তো?

—কিচ্ছু হজম হয় না দাদা, কিচ্ছু না। স্রেফ্ বার্লির জল! এবেলা—একটী গ্লাস, ওবেলা—একটী গ্লাস! ব্যস।

—এই খেয়ে থাকেন আপনি?

—তবে? ওর বাইরে উঁকি মেরেছি কি গিয়েছি। একেবারে রক্ত-আমাশা।

—কি মুস্কিল! 'মুস্কিল' ছাড়া আর কিছু কথা খুঁজে পান না বজ্রশীল, অন্যমনস্ক হয়ে একটা ডিমসেদ্ধ এক একবারে গিলতে থাকেন। টপাটপ্ ক'রে। আর টোষ্টের ওপর মাখন লাগাতে থাকেন পুরু ক'রে।

দেখতে-দেখতে সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে আসে কানাইবাবুর, গায়ে যেটুকু রক্ত ছিলো—উঠে পড়ে মাথায়। সাদা ফ্যাকাশে মুখে—বোধহয় কি বলছেন না বুঝেই—বোকার মত ব'লে ফেলেন—আপনার সাহস হয়, দাদা?

—সাহস? কিসের সাহস? আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেন বজ্রশীল।

—এই—এই—মানে এভাবে খেতে?

হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন বজ্রশীল বাজপেয়ী। বলেন—তা' বলেছেন ঠিক, ভায়া। মাসের শেষদিকের পকেটের অবস্থা চিন্তা করলে খাওয়ার সাহস ক'মে যায়। ওই জন্যেই তো খাওয়া-দাওয়া গেছে—একেবারে সিকি হয়ে গেছে। কোথা থেকে খাবো বলুন? পয়সা কোথায়?

কানাইবাবু অবশ্য হজমের দিক থেকেই সাহসের কথা তুলেছিলেন,—বজ্রশীলের উল্টো উত্তর শুনে, আর 'সিকি-হয়ে-যাওয়া' খাওয়ার নমুনা দেখে, তাঁর মনে কী যে ভাবের বন্যা এসে গেলো ভগবানই জানেন, আচমকা বজ্রশীলের হাত

জড়িয়ে ধ'রে ব'লে বসলেন—আমি আপনাকে খাওয়াবো, দাদা! দোহাই আপনার, 'না' করতে পারবেন না।

বজ্রশীল অবাক্!

—খাওয়াবেন? তার মানে? রোজ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেছি তো—আপত্তি শুনবো না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার অভাব কিছুরই নেই, অভাব শুধু হজমের। কেউ নির্ভয়ে খাচ্ছে দেখতে বড়ো আনন্দ পাই, দাদা।

—কিন্তু আমিই বা রোজ-রোজ আপনার পয়সায় খাবো কেন? আমারও তো একটা লাজ-লজ্জা আছে, মশাই?

—কিছু না, দাদা, কিছু না। আপনাদের মতো লোক দেশের গৌরব। বাজার খারাপ ব'লে আপনাদের খাওয়ার অসুবিধে হবে, এ যে আমাদেরই লজ্জা। ওসব কিছু ভাববেন না। বড় তৃপ্তি পাই, দাদা, কেউ নির্ভয়ে খাচ্ছে দেখলে।...তাহলে ওই কথা? কাল থেকে আমার ওখানেই আপনার ব্যবস্থা—।

অবিশ্যি এতো সহজে ব্যবস্থা হয় না।

অনেক তর্কাতর্কি অনুনয়-উপরোধের পর অবশেষে রফা হয়—সকালবেলার জলখাবারটা কানাইবাবু জোগাবেন।...নিজে হাতে ক'রে এনে কাছে ব'সে খাইয়ে যাবেন।

বজ্রশীলের সংসারে আপত্তি করবার কেউ নেই, একা মানুষ—শুধু একটা চাকর সম্বল। আর কানাইবাবুর সংসারেও অসুবিধের কিছু নেই, করিৎকর্ম্মা লোক তিনজন—বিধবা দিদি, আইবুড়ো ভাগ্নী আর চিরকেলে পিসিমা।

অতএব—এই অদ্ভুত ব্যবস্থাটা চালু হয়ে যায়।

টিফিন-ক্যারিয়ার-রহস্য এই।...

প্রত্যহ ভোরবেলা কানাইবাবু বাজারে গিয়ে নিজে দেখে শুনে, ডজন খানেক ডিম, বাছাই করা আলু দেড়কুড়ি, পাউন্ড দুই পাঁউরুটি, আর ছোট একটিন মাখন নিয়ে এসে রান্নাঘরে গিয়ে তদবিরে লেগে যান। তারপর বয়ে নিয়ে যাওয়া।

বন্ধুত্বের খাতিরে গন্ধমাদন পর্ব্বত বইতে পারে লোকে, আর এ তো সামান্য সের পাঁচ-ছয় খাবার!

তা' এসবই তো পুরনো কথা।

সৃষ্টিছাড়া হ'লেও—এক রকম খাপ খেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা? এটা তো কোনো মতেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। কানাইবাবুর মতো মরমী বন্ধুকে ঠেঙিয়ে 'হাফ্‌শেং' ক'রে ফেলা—মানুষের পক্ষে সম্ভব? সজ্ঞানে? সুস্থ মস্তিষ্কে?

অথচ—সম্ভব হয়েছে, দেখা যাচ্ছে! অজ্ঞান অসুস্থতার কোনো লক্ষণ অন্ততঃ বজ্রশীলের চেহারায় নেই।

সক্কালবেলাই এই কাণ্ড!

ভোর থেকে 'বালভোগ' আর ব্যায়াম পর্ব্বটী সেরে কিছুক্ষণ হলো বসেছিলেন বজ্রশীল, কানাইবাবুকেও যথারীতি আসতে দেখা গেছে কাঠির মতো সরু-সরু দুখানি হাতে টিফিন-বাক্সটি বয়ে খুট্‌খুট্‌ ক'রে।

তারপরেই যে কিসে কি হলো!

কিছুক্ষণ পরেই কানাইবাবুর কাতর আর্ত্তনাদ আর.....বাড়ীর মহিলাদের প্রবল চীৎকার শোনা গেলো ও-ফ্ল্যাট থেকে।.....তার ফাঁকে-ফাঁকে প্রহারের শব্দ এবং বজ্রশীলের হুঙ্কার।

আশপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সকালের কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি উঁকি-ঝুঁকি করতে থাকে। যেখান থেকে যতো পরিষ্কার দেখা যায় সেইখানেই আটকে পড়েছে এ-ও-সে।

ব্রজেনবাবুর গিন্নী আটকে পড়েছেন বসন্তবাবুদের রান্নাঘরে, গিরিশবাবুর শালী আটকে গেছেন কমলাদের বাথরুমে; ব্রজেনবাবু আর গিরিশবাবু হেমবাবুর শোবার ঘরে!

শোনো শোনো গল্প শোনো

এমন একটা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য কবে কার ঘটে বলো?

একটা 'লোক' আর একটা 'লোক'কে ধ'রে ঠেঙাচ্ছে—এ দৃশ্যটা এমন কিছু আহামরি নয়, রাস্তায়-ঘাটে হামেশাই চোখে পড়ে—রাস্তার কলের ধারে কি ফুট-পাতের টিউবওয়েলের কাছে।...কিন্তু—একজন ভদ্রলোক অপর এক ভদ্রলোককে বাড়ী বয়ে গিয়ে রদ্দা দিচ্ছেন—এ দৃশ্য?

সারাজীবনেও দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অনেক জন্মের তপস্যা থাকলে তবেই।

বসন্তবাবুদের তো সকালের কাজ কামাই, এদিকে হাড়গোড়-ভাঙা কানাই-বাবুকে ঘিরে ব'সে তাঁর ভাগ্নী ফোঁপাচ্ছে, দিদি ডুকরে-ডুকরে কাঁদছেন, আর পিসিমা তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন।...চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ভগবানকে ডেকে বলছেন—ও মুখপোড়া ভগবান, চোখের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? বলি—এখনো তো চন্দর-সূয্যি উঠছে—তবু এই অনাচার-অত্যেচার? ধম্মে সইবে? চোখ-কান খুলে একবার এই 'পাপ-পিথিমীর' দিকে তাকিয়ে দেখো দিকিন। বলি—গদাটা তোমার হাতে আছে কি করতে? চতুর্ভুজ সেজে সঙের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে?

অবশ্য ভগবানের চোখ-কান হাত-পা আছে কি নেই, এ সমস্যার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয়নি,—মুনি-ঋষিরা হার মেনে গেছেন। কাজেই হঠাৎ আজ কানাইবাবুর পিসিমার ভয়ে তিনি চোখ-কান হাত-পা থাকার প্রমাণ দেবার জন্যে গদা ঘোরাতে-ঘোরাতে বৈকুণ্ঠ থেকে তেড়ে আসবেন বজ্রশীল-বধ করতে, এতোটা আশা করা উচিত নয়। পিসিমাও করেননি।

অগত্যা তিনি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ক্ষান্ত হন।

দিদির ডুকরোনোটা থেমে ফোঁপানোতে পরিণত হয়; আর—ভাগ্নী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে হাঁপিয়ে প'ড়ে সেল্‌ফ থেকে একখানা 'রহস্যরোমাঞ্চ' নিয়ে বসে।

ওদিকে—বজ্রশীল বাজপেয়ী হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

গিরিশবাবুর দলের হঠাৎ খেয়াল ফিরেছে—অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে, এহেন সময় কথাটা পাড়লেন হেমবাবু!

বললেন—তা' তো হলো, মশাই, কিন্তু কানাইবাবুকে হাসপাতালে দেওয়া উচিত ছিলো বোধহয়।

শুনেই গিরিশবাবু তাড়াতাড়ি দড়ির আলনা থেকে গামছা পাড়তে-পাড়তে বলেন—তা' হয়তো ছিলো, আমার তো আবার এমাসে তিনদিন লেট্ হয়ে গেছে। দেখুন, যদি আপনারা—

ব্রজেনবাবু বলে ওঠেন—আমার কথা বাদ দিয়ে ভাববেন, ভায়া,—আমার বড়ো-বাবুটী যে কী চীজ্ সে ব'লে আর কি বোঝাবো!

বসন্তবাবু শুনতে না পাওয়ার ভাণ করে মাথায় তেল ঘষতে থাকেন জোরে।

হঠাৎ কমলাদের রান্নাঘর থেকে ব্রজেন-গিন্নীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো—'এ বাড়ীর বাবুরা সব কি গো! লোকটাকে কীলিয়ে-কীলিয়ে কীচকবধ করলে গো, আর এরা একটা পুলিশ ডাকতে পারলো না? ডাকাতটাকে হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতো তবে না—'

* * *

পুলিশ!

তাইতো!

চমকে ওঠেন ব্রজেন, বসন্ত, হেম, গিরিশ। সত্যি এটা তো এতোক্ষণ খেয়াল হয়নি কারুর।...হায়! হায়! বড্ডো 'মিস্' করা হয়ে গেছে। যখন কীচকবধ পর্ব্ব চলছিলো, সেই মোহাড়ায় পুলিশ এনে ফেলতে পারলে ভীমসেন জব্দ হয়ে যেতো একেবারে!...উঃ মাস্‌ল্ ফুলিয়ে-ফুলিয়ে যখন বেড়ায় লোকটা, দেখলে হাড়-পিত্তি জ্ব'লে যায়।

● একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে

ক'জনেই একসঙ্গে ব'লে উঠলেন—অ্যাঁ তাইতো। এটা তো মোটেই মনে পড়েনি।

মনে পড়বে কি—হেমবাবু বলেন—দেখে-শুনে হাত-পা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছিলো যে—কিন্তু উচিত বটে! আমাদের একটা ডিউটি আছে তো? প্রতিবেশী আমরা—আবার চমকে ওঠেন সবাই। কী সর্ব্বনাশ! তাই তো! এতো বড়ো একটা গুরুতর কথা ভুলে যাচ্ছিলেন তাঁরা? প্রতিবেশী! সোজা দায়িত্ব!

একজন অপর একজনকে ঠেঙিয়ে শেষ ক'রে যাবে. আর এঁরা বিচারের ব্যবস্থা করবেন না? এ অসম্ভব। এ হতেই পারে না। বিবেক ব'লে একটা কথা আছে তো?

—এসব কেসে ছ'টি মাস ঘানি, কি বলেন, হেমবাবু?—ব্রজেনবাবু উৎফুল্ল হয়ে বলেন।

হেমবাবু দুই হাত উল্টে বলেন—জানিনে মশাই, আগে তো তাই ছিলো। মারপিটের তিন মাস, অনধিকার প্রবেশের তিন মাস।...এখন স্বাধীন রাজ্যে যে কি হয় আর কি না হয়, কে বলবে? আইন ব'লে তো কিছুই নেই এখন! আইন সবাইয়ের নিজের হাতে। ওইটুকুই যা লক্ষণ স্বাধীনতার। সে যাক্—তবু খবরটা দেওয়া উচিত।

এ বাড়ীর বাবুরা সব কি গো! [পৃঃ—১৯৩

● একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে

শুনে সকলেরই হঠাৎ উচিতবোধ টনটনে হয়ে উঠে। আর বেশ তোড়জোড় ক'রেই খবরটা দেন তাঁরা।...বজ্রশীল লোকটা যে ভদ্রবেশী গুণ্ডার সর্দ্দার ছাড়া কিছু নয়, সেটা বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দিতে ছাড়েন না; নিতান্ত খুন হয়ে যাবার ভয়েই তাঁরা কানাইবাবুকে রক্ষা করতে ছুটে যেতে পারেননি, তাও পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন; এবং বজ্রশীলের একটা হেস্তনেস্ত না হ'লে যে এ-বাড়ীতে যে-কোনোদিন যে-কেউ খুন হয়ে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে অবহিত ক'রে রাখেন পুলিশকে।

অফিস কামাই ক'রেই এই কর্ত্তব্যকর্ম্মটী সারেন তাঁরা!

উঃ! চেহারার অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে বেড়ায় লোকটা।...'চীট্' হয়ে যাবে এইবার।...মাস্‌ল্ ফুলিয়ে আর গোঁফে 'তা' দিয়ে বেড়ানো বেরিয়ে যাবে।

যতোই গণ-স্বাধীনতার রাজ্য হোক—তিনটে মাসও কি আর শ্রীঘরবাস না হবে?

দরকার হ'লে চাকরী ছেড়ে দিয়েও সাক্ষ্য দেবেন তাঁরা।

অনেকের একটা ধারণা আছে—দরকারের সময় পুলিশের দেখা পাওয়া যায় না! খুব ভুল ধারণা।

সে-ধারণা বদলাতে চান তো চৌধুরী হাউসের এগারো নম্বর ফ্ল্যাটে চ'লে যান। দেখুন গিয়ে—কী রকম জোর পুলিশ-এনকোয়ারি চলছে।

কানাইবাবু যখন মার খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কোন্‌দিকে কাৎ হয়ে পড়েছিলেন আর বজ্রশীল কোন্ মুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এই নিয়ে পিসিমাকে জেরায় জেরায় জেরবার ক'রে ফেলে ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক যখন কানাইবাবুর দিদিকে প্রশ্নে জরজর করছেন, তখন বজ্রশীল আর থাকতে পারেন না। বলে ওঠেন—ওনাদের অতো কষ্ট দিচ্ছেন কেন, মশাই, ছাড়ান দেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আমার কাছে যা পাবেন, একেবারে নীট্।...নিন, বলে যাচ্ছি—লিখে নিন গুছিয়ে।...হাতকড়া এনেছেন নাকি? আনেননি? এ—হে—হে। বড়ো মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এঁরা।...কি বলেন গিরিশবাবু? বড়ো আশা ক'রে ডেকে এনেছিলেন! তা যাক্—দড়ি নেই? তা'তেও

কাজ হবে। না থাকে ওঁরাই সাপ্লাই করবেন।...হ্যাঁ, কি বলছিলাম? প্রথম থেকেই লিখে যান—আমি শ্রীবজ্রশীল বাজপেয়ী অমুক ষ্ট্রীটে অমুক হাউসে অমুক নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। আমি আমার প্রতিবেশী কানাইলাল সরকারকে মারপিটের অভিযোগ স্বীকার করছি।...হ্যাঁ খুব জবর মারটাই দিয়েছি। কোন্ দিকে মাথা দিয়ে কোন্ ভাবে কাৎ হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটা বলা সম্ভব নয়, কারণ তালগোল পাকিয়ে পড়েছিলেন। প্রাণটা কেমন ক'রে যেন সেই তালগোলের মধ্যে আটকে গিয়ে টিকে রইলো। অবিশ্যি খুবই লজ্জার কথা এটা,—আমার পক্ষে খুবই লজ্জার ব্যাপার। অভিযোগটা খুনের হ'লে তবু ভদ্রসমাজে একটু মুখ থাকতো, ওই চড়াইপাখীর প্রাণটুকু আমার হাতে প'ড়েও হাত ফসকে পালিয়ে গেলো, ছি ছি! কি করবো—ওই যে দজ্জাল পিসিটীকে দেখছেন? ওই উনিই যতো নষ্টের গোড়া! নইলে—খুন করবার প্রবল প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো তেড়ে গিয়েছিলাম আমি।...কি বলছেন? কানাইবাবুকে খুন করার ইচ্ছে আমার এতো প্রবল হয়ে উঠলো কি কারণে?...তাহলে—খুলেই বলি, মশাই, বিশ্বাস করা না-করা আপনাদের হাত।...এ ইচ্ছে আমার হঠাৎ একদিনের নয়—এ ইচ্ছে দীর্ঘদিনের।...একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসই এর কারণ!...হ্যাঁ কেবলমাত্র একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে!...না—কথাটা খুব ঠিক হলো না—'একটী' নয়—দৈনিক একটী ক'রে।...ওই একটী করে দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে একবার ক'রে খুন চেপে উঠেছে আমার মাথায়—দৈনিক একবার ক'রে। কিন্তু হলো না! বড়ো মুখহেঁট হয়ে গেলো, মশাই।...কি বলছেন? নিঃশ্বাসটা কার?... ও তাহলে—বিশদ ক'রেই শুনুন—প্রথম দিন থেকেই শুরু করি।

আমি যেদিন এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে এলাম, কানাইবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এলেন আলাপ করতে।...খালি গা, কাঁধে তোয়ালে, দুটো পাঁজরের ছ-খানা ছ-খানা বারোখানা হাড় যেন চামড়া ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে।...সেই প্রথম—সেই পাঁজর ক-খানা ঘুঁসিয়ে গুঁড়ো ক'রে দেবার জন্যে হাতটা নিসপিস ক'রে উঠেছিলো আমার।—কেন জানেন? ওই যা বললাম—একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে! ...ফোঁস ক'রে একটী নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন—'আপনাকে দেখে বড়ো আনন্দ হলো দাদা, আপনাদের মতো লোক পাড়ার ভরসা!'

তারপর অবশ্য—বন্ধুত্ব হলো।...বেশ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।...

মিথ্যে বলবো না, কানাইবাবুর আকিঞ্চনেই হলো।—উনি আমাকে খাওয়াতে শুরু করলেন।...হ্যাঁ, তা খুব খাইয়েছেন ভদ্রলোক। প্রথম দু-চার দিন বেশ খেলাম। যতোই হোক পরের পয়সায় খাওয়ায় একটা সুখ আছে বৈকি, কিন্তু তাই ব'লে বারোমাস? মানুষের শরীরে চক্ষুলজ্জা ব'লেও একটা জিনিস আছে তো?...আমি একটা জোয়ান-মদ্দ লোক—বারোমাস তিরিশদিন চব্যচোষ্য ক'রে আর একজনের পয়সায় খাবো?...কি বলছেন? অবান্তর কথা বলবো না?..... কই আর বলছি, মশাই? সর্ট-কাটেই সারছি। ওনাকে অনুরোধ করি—"ভালো রান্নাবান্না ওঁর বাড়ী থেকে করিয়ে দেন—খুব উত্তম, খরচটা নিন"—সে হবে না। বলতে গেলেই জোড়হাত। খরচটা নিতে হলে নাকি উনি লজ্জায় হার্টফেল করবেন।...বুঝুন? আমার অবস্থাটা বুঝুন?...ওঁর আর্গুমেণ্টটা কি জানেন? সামনে বসে থেকে কাউকে খাওয়াতে পারলে—মানে আর কি, নির্ভয়ে কেউ গো-গ্রাসে খাচ্ছে দেখলে উনি নাকি স্বর্গসুখ পান।... সেই নির্ম্মল স্বর্গীয় সুখ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবো আমি?

একাসনে বসে সাড়ে তিন সের মাংসের কোর্ম্মা...[পৃঃ ১৯৮

অবিশ্যি, আমার মতো এতোটা না হোক—খাইয়ে লোক কি আর খুঁজলে মিলতো না—তাঁর দিদির ভাসুরপো আর পিসির দেওরপোর দল থেকে? মিলতো। কিন্তু

তাদের যে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না কানাইবাবু। আমি বন্ধুলোক—তা' ছাড়া—একাসনে ব'সে সাড়ে তিন সের মাংসের কোর্ম্মা, বাইশটা বড়ো গলদা, দু-কুড়ি তপ্‌সে, ছত্রিশটা ল্যাংড়া আম, সবাই না পারতেও পারে!...কাজেই কানাইবাবুকে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারিনে, খেয়ে যাই। রোজই খাই। অবিশ্যি খিদের মাথায় ভালো ভালো জিনিস দেখলে মাথার ঠিক রাখতে পারিনে আমি গো-গ্রাসেই খেয়ে ফেলি, কিন্তু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মশাই চড়াৎ করে খুন চেপে ওঠে মাথায়!.....কেন? ওই তো বলেছি আগেই।.....আমি যতোক্ষণ খাই, নিষ্পলকনয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক, হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি আমি—পলক পড়ে না!...আর খাওয়া সাঙ্গ হ'লেই—ওঁর ওই ঝরঝরে ভাঙা খাঁচাখানা ঠেলে বেরিয়ে আসে একটী মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস। সেই নিঃশ্বাসটী ফেলে—খালি কৌটোগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে শান্তভাবে বলেন—'যাই দেখি, বার্লিটা জুড়িয়েছে বোধহয়।' ...বলুন? বলুন আপনারা? এতে মাথায় খুন চেপে ওঠে কিনা? পাঁজরের ওই আধ ডজন ক'রে হাড়, এক একটী ঘুসিতে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে কিনা?...অনেক কষ্টে সে-ইচ্ছেকে দাবিয়ে রেখে এসেছি, মশাই, এতোদিন, আর পারা গেলো না।... আজ সকালে ব'সে ব'সে ভাবছি—কি ক'রে কানাইবাবুকে নিবৃত্ত করি!...কি সৎ-পরামর্শ দিয়ে? পাকা কলার ঝোড়া নিয়ে চিড়িয়াখানায় যেতে বলবো?...হয়তো—তা'তেও এই অপার্থিব সুখটুকু পেতে পারেন। না কি—কি তাই ভাবছি—এমন সময় কানাইবাবু হাজির।...আজ আবার নিয়মছাড়া, এলাহী কাণ্ড! দেখে রেগে উঠলাম, মশাই, বললাম—সব ফিরিয়ে নিয়ে যান—কিন্তু কানাইবাবু নাছোড়বান্দা, কাতর মিনতি ক'রে বললেন—রাগ করবেন না বজ্রবাবু, আজ আমার জন্মদিন, তাই আমি যা-যা ভালোবাসি, দিদি সব রেঁধেছে!...দিদির ভাসুরপো আর পিসিমার দেওর-পোদের নেমন্তন্ন। অর্দ্ধেক রাত থেকে রান্না আরম্ভ হয়েছে—ওরা খেয়ে অফিস যাবে কিনা—ব'লে—একে একে কৌটা খুলে বার করতে থাকেন—তিন রকম মাছ, দু-রকম মাংস, ডিমের তিন-চার প্রস্থ, লুচি, পোলাও, চাটনি, ভাজা, দই, সন্দেশ, দরবেশ, পান্তুয়া, পিঠে, পায়েস। এ সবগুলিই নাকি কানাইবাবুর প্রিয়!

বললাম—করেছেন কি, মশাই? একটা লোক একসঙ্গে এতো খেতে পারে?

● একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে

কানাইবাবু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—"কেন লজ্জা দিচ্ছেন, দাদা? আপনার কাছে এ আর কি? নস্যি বৈ তো নয়?"

কি বলেন আপনারা?

ঘুসিকে আরো সামলে রাখা যায়? তবু রেখেছিলাম—বন্ধুত্বের খাতিরে—পাকানো ঘুসি আলগা ক'রে একে-একে টেনেও নিয়েছিলাম সব।...পায়েসটা পেরে উঠছিলাম না; তাও সেঁটে ফেললাম কোনো গতিকে, কিন্তু যেই শেষ হলো?...সেই—সেই ব্যাপার।

পাঁজর-কাঁপানো হৃদয়-নিংড়োনো বুকভাঙা একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস!

তার সঙ্গে সঙ্গে—যাই দেখি, বার্লিটা হলো কিনা—আজকে হয়তো—নাঃ কথাটা শেষ করতে দিইনি। মাংসের ঝোল আর পায়েসের ক্ষীর মাখা হাতেই ধাঁই ক'রে নাকের ওপর বসিয়ে দিয়েছি একটী বিরাশী সিক্কার ঘুসি!

নাকের ওপর বসিয়ে দিয়েছি একটী বিরাশী সিক্কার ঘুসি

নিঃশ্বাসের ভাঁড়ারঘর যেটাই হোক—নাকটাই তো তার সদর দরজা?

বিশ্বাস করুন, মশাই, মাত্র একটী! নাকটা চেপে ধরলেন ভদ্রলোক কোঁচার খুঁট তুলে। রক্ত গড়িয়ে পড়লো হাতের ফাঁক দিয়ে!...মাথা হেঁট ক'রে এগোতে লাগলেন নিজের ঘরের দিকে।...আর পুনশ্চ সেই ঘটনা! আর কতো সহ্য হয়, মশাই? সহ্যশক্তির একটা সীমা তো আছে? না হয়—বার্লি খেয়েই থাকিস্, তাই ব'লে—নাকে ঘুসি খেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাবি? পারলাম না...কিছুতেই পারলাম না—ছুটে গেলাম পিছন পিছন।...তার পর যা ঘটেছে—এই এঁরা তো সবই জানেন্!

● একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের জন্যে

আমার চেয়ে বরং ভালোই বলতে পারবেন। তা ছাড়া—কানাইবাবুর অবস্থা দেখলেও আন্দাজ করতে পারবেন। অবিশ্যি ফার্ষ্ট এড্‌টা আমিই দিয়েছি, যাচ্ছিলাম ডাক্তার ডাকতে—এমন সময় দয়া ক'রে গরীবের কুঁড়েয় আপনারা—এতো কিছুর দরকার হতো না, মশাই, একেবারে সাবড়ে ফেলতে পারতাম—ওই পিসি। আরে বাবু, মেয়ে-ছেলে আছো, রান্নাঘরে বসে থাকো—মারপিটের মধ্যে আসা কেন?...কি আর করবো, লোক-লজ্জা একটা ছিলো কপালে! খুনের দায়ে ফাঁসি যেতাম—তার একটা মাহাত্ম্য ছিলো। দু-পাঁচ বছর পরে পাঁচজনে 'শহীদ' বলতে আরম্ভ করতো—হয়তো বা স্মৃতিবার্ষিকী-টার্ষিকীও হতো।...এ যেন সেই 'ইয়ে' মেরে হাতে গন্ধ! দূর ছাই! ...নিন মশাই—দড়াদড়ি কি আছে বার করুন।...হাতটা আবার কেমন নিসপিস করছে। হাতের সামনে মেলাই নাক দেখতে পাচ্ছি কিনা। বসন্তবাবুর নাকটা আবার বড্ডো বেশী খাড়াই!...না না, নাকটা অতোটা বাড়াবেন না, বসন্তবাবু, কিসে কি হয়ে যেতে পারে বলা যায় না...আপনার তো আর পিসিমা নেই!

সমাপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর